শুভতারা

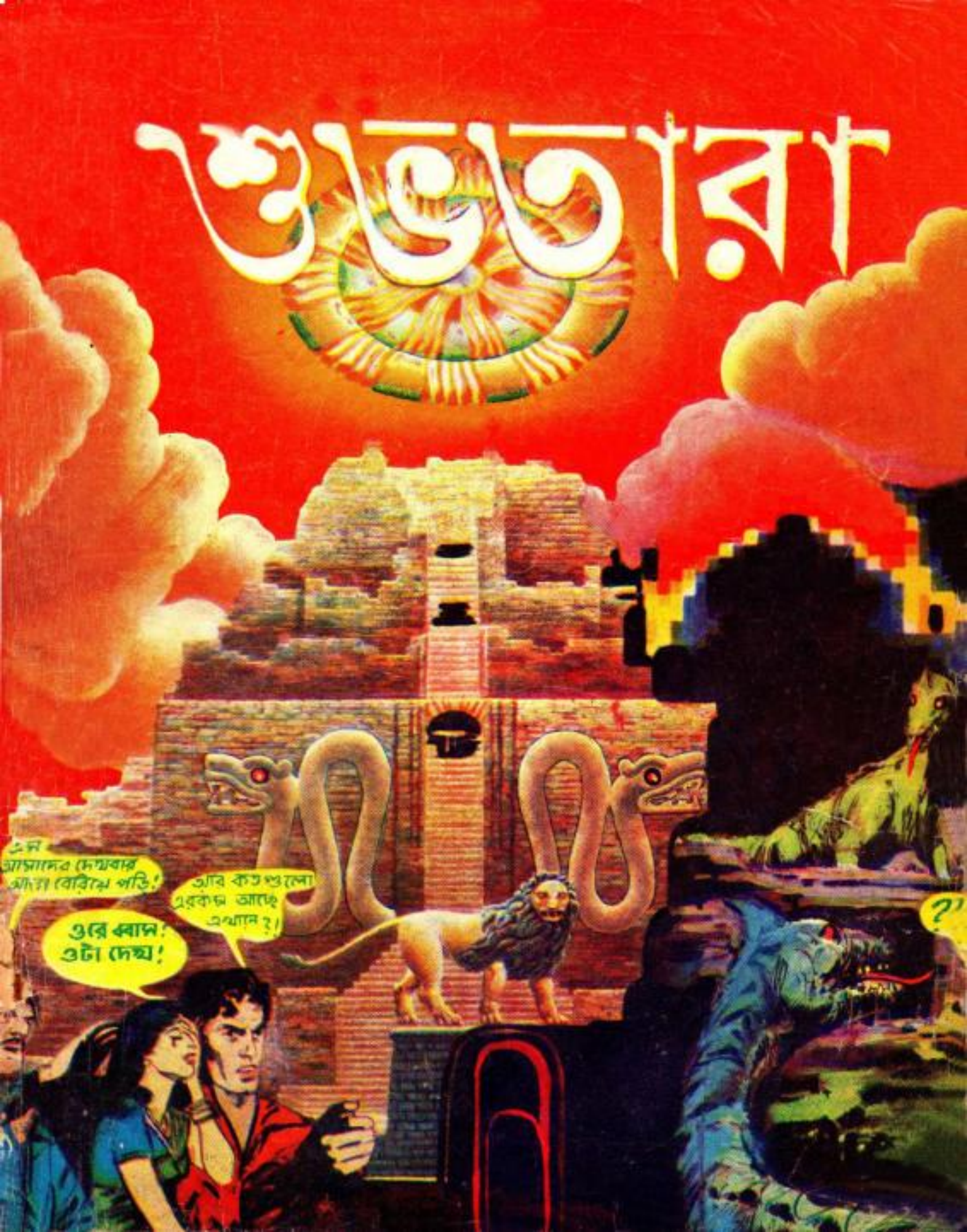

কাগজ কেটে পুতুল করো

ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

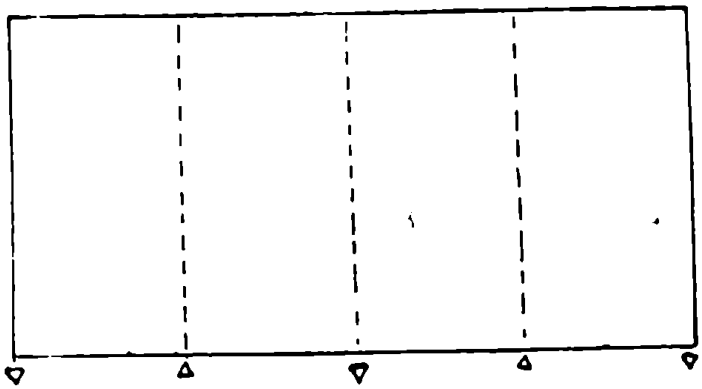

যমজ ছেলের ছবি
কিভাবে করতে হবে ?

মোটা কাগজ নাও, যে-কোন কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে।

ছবিটা এভাবে কালো কিম্বা যেকোন রঙ দিয়ে করে নাও, ছবিতে দাগ কাটা আছে দেখো। শেষের দাগ থেকে কাগজটায় ছবি আঁকো দুটো কিম্বা অনেক। একবার ভাঁজ করো, আরও একবার ভাঁজ করে নাও। মাঝামাঝি আঁকা পর্যন্ত যেভাবে দেওয়া আছে ছবি দেখে কাটো। কাটার পর দেখ এবার দুটো চেহারা ছবি হয়ে গেছে।

এবার আরো ছবি করতে পার আরো ভাঁজ করে নাও কিন্তু তোমার সব ছবির একদিক সমান হবে না তার কারণ অনেকগুলি রাখলে একটার সঙ্গে একটার ছোঁয়া কিছুটা থাকা প্রয়োজন।

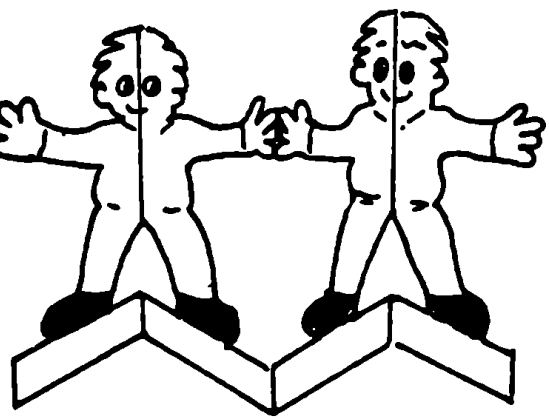

এখন ছবির কালো অংশ কাটো দেখ ঠিক ঐ রকম হবে। একটা তৈরী করে পাঠাতে পার। পরের সংখ্যায় তোমার নাম ছাপা হবে।

সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ 'শুভতারা' দ্বিতীয় সংখ্যা ভাদ্র ১৩৯০

সম্পাদক :

অমিতাভ সেন

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হঠাৎ যা হ'লো। আশাপূর্ণা দেবী / ৭৮
লুটেরা। অদ্রীশ বর্ধন / ৮৬
অন্ধকার হোটেলের অতিথি। রহস্যময় রায় / ৯৯

বড় গল্প

ঘোড়াওলা। জগবন্ধু হালদার / ১৩৪
গোয়েন্দা। সৌরেন দত্ত / ১২৬

কল্প বিজ্ঞান

বাতিঘরের রাক্ষুসে পাহাড়
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১৫

গল্প

আত্মরক্ষা। প্রভাস মল্লিক / ১৪০
ঠাকুর রামকৃষ্ণ। নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী / ১০৯

বিশেষ রচনা

বিভীষিকার নায়ক অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় / ১২১
যাদু-সম্রাট ওজ-এর চিত্রকথা। পুর্ণেন্দু সেন / ৮৩

কমিক্‌স চিত্রে কাহিনী

মহাকাশে বিপদ সংকেত। অমিতাভ সেন / ১১০
মটু দি গ্রেট। মৈত্রেয়ী বিশ্বাস / ৭৬
শয়তান ও টারজান। অভীক মিত্র / ১৩৮

শব্দমালা, অনুসন্ধান, চিঠির জবাব, খবর আর খবর, ধাঁধা, হেঁয়ালী, ছবি আঁক

শব্দমালা। প্রদীপ দত্ত / ১৩৩
অনুসন্ধান। চন্দন বসু / ১৪৫
ছবি আঁকো। তাপসী আইচ / ১৪৫
ধাঁধা ও হেঁয়ালী। পাটুলি পুত্র / ১৪৬
একথা কি সত্যি। শান্তি দে / ৮১
চিনতে পারো? রুণা দেব / ১১৩
জান কি? জবাব। নন্দিতা বসু / ১৪৬
মজার খবর। বরুণ মজুমদার / ১৪৪

খেলাধুলার আসর

খেলার খবর। জয় গুপ্ত / ৮২
ছবির খেলা। রুপালী সাহা / ১০৮
অভিনন্দন। ধীরা বক্‌সী / ১১৩
বুদ্ধির খেলা। বিষ্ণু দত্ত / প্র. ৩
যমজ ভাই। ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায় / প্র. ২
(খবর) বোলিং পার্থসারথী দত্ত / ১৪৩

নটরাজ প্রকাশনের পক্ষে নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী কর্তৃক ১/সি দুর্গা পিথুরী লেন, কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মুদ্রণ : ইম্প্রেশন, কলিকাতা-৬
জয়শ্রী প্রেস, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউগয়া আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৯

ব্লক : রয়েল হাফটোন

** শুভতারা : ২৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : ২ টাকা ৫০ পয়সা। Rs. 2·50

মটু দি গ্রেট / মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

মটু পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিশ করছিল, 'রক ষ্টোরের সাজানো বরফ চাঁইয়ে চড়ে।
কিন্তু হড়কে—ছিটকে কেলেঙ্কারী হয়েছে····· ?

মটু দি গ্রেট / মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

চারিদিকে বরফ বৃষ্টির ফলে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে ! মটু কোথায় পড়েছে দেখো..... !

মটুর বাবা ব্যান্ড বাদক, মটুর ওপর রেগে.....!

বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না – হঠাৎ আমি লটারিতে হাজার পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলাম। শুনে তোমরা হয়তো মুচকি হেসে ভাববে—টাকা কিনা গাছের ফল? পেলেই হ'ল! লটারির টাকা, ক্রসওয়ার্ডের টাকা এসব আবার সত্যি পাওয়া যায় নাকি কখনো? ওসব ছাপার অক্ষরেই দেখা যায়। এই তো আমাদের "অমুক" আজন্ম লটারির টিকিট কিনে আসছে, তোমার গে—"অমুক" তা ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়ে হাঁ করে বসে আছে দৈবধন পাবে বলে। কই? পেয়েছে কেউ আজ পর্যন্ত?

তাও এক আধটা নয়—প···ঞ্চা···শ হা···জা···র! কিন্তু কি করবো, তোমাদের চোখ টাটাবে বলে তো আর সত্য গোপন করতে পারিনে! ভাগ্য-ক্রমে পেয়েই গেলাম। আর ওদের চেক্ ভাঙিয়ে টাকাটা একবার হস্তগত করে নিয়ে রেখে দিলাম আমার পাড়ার ব্যাঙ্কে।

পাড়ার বলে হেনস্তা মনে করবার কিছু নেই—ব্যাঙ্কটা ভালো।

তারপর টাকা আছে টাকার জায়গায়, আমি আছি আমার জায়গায়; পৃথিবী যেমন ঘুরছিল তেমনিই ঘুরছে, আমিও যেমন ঘুরছিলাম তেমনি ঘুরছি—চাকরির চেষ্টায়।

পাড়াপড়শী বা বন্ধু-বান্ধব, যাঁরা আমার এ-হেন ভাগ্য-পরিবর্তনে সনিশ্বাস আনন্দ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন—"তোমার আবার চাকরির দরকার কি বাপু? একলা মনিষ্যি—পুষ্যির মধ্যে তো একটা চাকর কত খাবে? পায়ের উপর পা দিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকো, সুদের টাকাতেই রাজার হালে চলে যাবে।"

কিন্তু "কলসীর জলের" উদাহরণও তো ফেলবার নয়!

তা'ছাড়া—হাত-পা থাকতে মানুষ বসে থাকতে পারে? অতএব এ দরজা থেকে ও দরজা, এ

হঠাৎ যা হ'ল?

আশাপূর্ণা দেবী

সাহেবের কাছ থেকে ও সাহেবের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা হৃষ্টপুষ্ট চাকরি জোগাড় করতে পারলেই—আধলাখ টাকার একটি মোটা অঙ্ক খসিয়ে—পৃথিবীর যেসব লোভনীয় বস্তুগুলোর দিকে এতদিন বেচারার মত শুধু তাকিয়ে এসেছি—সেই সব বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে গুছিয়ে বসবো এই ইচ্ছে।

ইতিমধ্যেই কনের বাবার চর আনাগোনা করতে শুরু করছিল—কিন্তু ঘরের টাকা পরের মেয়েকে খাওয়াবার সখ আমার নেই জানিয়ে দিলাম। সুরেন আর আমি, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। সুরেন আমার 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড', জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব পারে ও। পারে না শুধু টাকা ফুরিয়ে গেলে যোগাড় করতে—মাঝে মাঝে ওই

ঝামেলাটাই নিতে হতো আমাকে। আশা করছি ওটাও কমলে।

ভগবানের দয়ায় চট্ করে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না।

কথায় বলে "বিধি যখন মাপান উপরো-উপরি চাপান"। কথাটা সত্যি, নইলে এতদিন চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—জোটেনি, আর এখনি ঝট্ করে জুটে গেল।

সবই ঠিকঠাক হয়ে গেল—তবে চেয়ারটা খালি হতে প্রায় মাস দেড়েক বাকী আছে। আপাতত যিনি চেয়ারের মালিক, অক্টোবরের আগে তাঁকে নামানো যাবে না এইরকম বন্দোবস্ত।

ভেবে দেখলে মন্দ কি? এই দু'মাস ফূর্তি করে বেড়াই, আর গাড়ি রেডিও, রেকর্ড, গ্রামোফোন, আলমারি, দেরাজ, টেবিল, আয়না, জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, বই-বুকসেলফ্, ক্যামেরা, পোর্টেবল্ টাইপরাইটার ইত্যাদি যাবতীয় লোভনীয় জিনিস সংগ্রহ করি।

আগের আমল হলে অবিশ্যি ওই টাকাতেই সব হতে পারতো নতুন আনকোরা। এখন কিছু কিছু 'দ্বিতীয় হস্তের' চেষ্টা দেখতে হবে, তাই দেখছি। দুপুর রোদে ট্রামে বাসে টো-টো করে বেড়াচ্ছি যেখানে সেখানে—হঠাৎ যা হ'ল—সেই কথাটাই বলি।

চলন্ত ট্রাম থেকে নামা আমার চিরকালের পেশা, রোজ নামি সেদিনও নামছি—হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল জানি না। শুধু মনে পড়ে যেন—একটা প্রবল ভূমিকম্প,···একটা প্রচণ্ড ঝড়···একটা প্রাণান্ত আর্তনাদ একমুঠো পীতাভ সরষে ফুল··· ব্যস্ তার পরেই সব অন্ধকার! যেন মহাসমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকলাম।

কতক্ষণ জ্ঞানহারা হয়ে ছিলাম ভগবান বললেও বলতে পারেন, কে যে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়িতে তুলেছে—ভগবানও বলতে পারেন কিনা জানি না—মোটের মাথায় জ্ঞান পেয়ে দেখলাম—শুয়ে আছি আমার নিজের বিছানায়; আর সেই বিছানা ঘিরে—সামনে পিছনে—এপাশে ওপাশে—দরজার সামনে, জানলার মাথায়, বারান্দায় আর সিঁড়ির মুখে অগণিত নরমুণ্ডের সারি।

বিকারের ঝোঁকে দেখা কায়াহীন ছায়ামূর্তি নয়, দস্তুরমত রক্তমাংসের ব্যাপার। টাক আর টিকি, বাঁকা সিঁথি আর ব্যাক্‌ব্রাশ,—ঘোমটা আধ-ঘোমটা—চেনা আর অচেনার—বিরাট সমারোহ। সেই অনন্ত জোড়া চোখ আমার একখানি মাত্র মুখের পানে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

আন্দাজ করলাম, আমি মারা গেছি এটা তারই শোকবাসর। এত সকালে কষ্ট করে আমার শেষকৃত্য করতে এসেছে দেখে বড় কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম, কিন্তু মারা যাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি আছে কি নেই, ঠিক জানা ছিল না বলেই আবার চোখ বুজলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম, হয়ত পুরোপুরি মরিনি। এতগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত বাক্‌যুদ্ধের থেকে আবিষ্কার করলাম সৃষ্টিছাড়া গোঁয়ার্তুমির ফলে নাকি মরতে বসেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি এত সব প্রায় অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বা পাড়াপড়শীর সঙ্গে যে খুব বেশী "গলায় গলায় ভাব" ছিল এমন নয়, কিন্তু মহানুভব এঁরা আমার বিপদ দেখে স্থির থাকতে পারেন নি—ছুটে এসেছেন।

হায়! ওবছরে যখন টাইফয়েড জ্বরে একচল্লিশ দিন বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিলাম, তখন যদি এঁরা খবর পেতেন! বোধ হয় খবর পাননি বলেই আমার অত দুর্গতি গেছে, একলা সুরেন ক'দিক

সামলায় ?

কিন্তু এবারে ? কে কা'কে খবর দিলে কে জানে ! জ্ঞানটা আর একটু পরিষ্কার হতেই—(হায় তখন কে জানতো জ্ঞানের রাজ্য সীমাহীন)—সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম—"এখন বেশ ভালো বোধ করছি, এইবার এক পেয়ালা চা পেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি—"

'হাঁ হাঁ' করে যোগীন মাস্টার ছুটে এলেন—"বলেন কি মশাই, এ অবস্থায় চা ? স্রেফ বিষ যে ! বরং ঠাণ্ডা একগ্লাস মিশ্রীর পানা কিংবা ডাবের জল—"

"আরে রেখে দিন আপনার ডাবের জল"—আমার জ্ঞাতি ভাগ্নে গোরাচাঁদ তেড়ে উঠলো—"যদি বাঁচতে চাও অমিয় মামা, নির্জলা এক আউন্স ব্রাণ্ডি। দেখেছি তো খেলার মাঠে ! আধখানা শরীর উড়ে গেল—বাকী আধখানা নিয়েই ঝেড়ে উঠে 'রাণ' দিলে— কার জোরে ? ওই ব্রাণ্ডির।"

—"ওসব ব্র্যাণ্ডি ম্যাণ্ডির কথা ছেড়ে দাও বাছা"—একটি আধময়লা থানপরা বিধবা এগিয়ে এলেন—"তার চেয়ে একটু হালুয়া করে দিই, গরম গরম খেয়ে গায়ে বল পাক। কথায় বলে হাঁটু ভাঙ্গা ! বাছার আমার সেই হাঁটু গেছে ভেঙে।"

মুখ দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না—ভাবছি কে হতে পারেন ইনি। তিনি নিজেই সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলেন—"আমায় চিনতে পাচ্ছো না বাবা অমিয় ? আমি যে তোমার মাসী হই ! তোমার মার আপন জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ মামাতো বোন। আহা বিপদ শুনে দুঃখে আর বাঁচিনে। তা, একটু গরম হালুয়া করে দিই—কেমন ?"

ব্যস্ত হয়ে বলি—"আপনি কেন কষ্ট করবেন ? আমার চাকরই করে দেবে···সুরেন শোন—"

'সাক্ষাৎ মামাতো বোন' আরো ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন—"ওরে বাবা, এখন আর চাকর-বাকরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি তোমায় ? কত দুঃখে প্রাণটুকু যদি ফিরেছে—"

আধময়লা থানের ওপর টেক্কা দিয়ে একটি চওড়া-পাড় ফরসা শাড়ি এগিয়ে এলেন—"সে কথা আর বলতে ? তোমার মামা তাই বলছিলেন, অমিয় কি আমার পর ? আমাদের 'খেঁদির' ছেলে ও, আজ 'খেঁদি ঠাকুরঝি' নেই তাই—" বলে প্রায় বিশবছর আগের শোক স্মরণ করে গলাটা কাঁপাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু শুধুই তো মামী মাসী নয় ? পিসিও আছেন। রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বেশী নিকট বলেই বোধ করি আমার রক্তপাতে কাতর হয়ে এতক্ষণ শুকনো চোখ দু'টি আঁচলে রগড়ে রগড়ে প্রায় পাকা করমচা করে তুলেছিলেন, এখন—খেঁদির সূত্র ধরে মামীর এতদূর ঘনিষ্ঠতায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—"যে যাই বলুক অমি, তুই যে আমার হাবুলদার ছেলে সে তো কাউকে বলে বেড়াতে হবে না—প্রাণের টান দেখলেই বোঝা যাবে। কথায় বলে 'বাপের বোন পিসি, ভাতকাপড় দিয়ে পুষি'—তা' নইলে যেই মাত্তর শুনলাম, মুখের ভাত ফেলে ছুটে এলাম কেন ?"

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলি—"ছি ছি, কি অন্যায় ! খাওয়া হয়নি আপনার ? তা'হলে সুরেন কিছু মিষ্টিটিষ্টি এনে দিক্ একটু জল খান।"

—"তার জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না বাবা, বিধবার আবার উপোস, পাঁচ দিন না খেলেও—"

পাড়ার সবজজ-গিন্নি একখানি বেতের চেয়ারের মধ্যে কোনো প্রকারে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন,—একটু মুচকি হেসে বললেন—"না না, ব্যস্ত তোমায় হতে হবে না বাবা, ব্যবস্থা হয়েছে বৈ কি ; এই যে সুরেন ছানা,

দই, ডাব আর মর্তমানের ছড়া নিয়ে বাড়ি ঢুকলো দেখলাম।"

পিসিমার কালি মাখা মুখের দিকে চাইতে পারি না। পাশের বাড়ির যে দন্তমাণিক ছোকরাটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, দেখি সেও এসে দাঁড়িয়ে আছে। মামী মাসীদের একটু থামতে দেখে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে—"এই যে, দাদা জ্ঞান ফিরেছে? মনে কিছু করবেন না—বলি তা'হলে —আপনি দাদা মহাকেপ্পন! অতগুলো টাকা মুফৎ পেলেন—একখানা গাড়ি কিনতে পারলেন না? সেই টো-টো কোম্পানীর ট্রামে চড়ে আনা-গোনা! ভাঙবে না হাঁটু? ভগবানই দিলেন ভেঙে।"

ভগবান বেছে বেছে তাকেই খবরটা দিয়ে গেলেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও বললাম,—"গাড়ি আজকাল চট্ করে কেনা শক্ত—খুঁজছি তো একখানা—"

—"একখানা? কত চান? কাটুন একখানি হাজার দশেকের চেক্, এখুনি গাড়ি এনে দোরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। শুধুই 'ফ্যা ফ্যা' করে বেড়াই না দাদা—অনেক তালে থাকি।"

—"ভালো গাড়ি?"

—"ভালো তো নিশ্চয়, তবে যদি 'রোলস্ রয়েস' চান আলাদা কথা। তবে অবিশ্যি দাম যোগাতে আর একবার ফার্স্ট প্রাইজ পেতে হবে।"

বললাম—"পাগল! ছোট্ট একখানা 'বেবি' গাড়ি হলেই চলে যাবে, অনেকদিন থেকে সখ আছে!"

যদিও ছোকরাকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, তবু মনে হ'ল ওর 'থ্রু' দিয়ে গাড়িটা যদি সুবিধেয় পেয়ে যাই মন্দ কি? সত্যি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বটে, খবর রাখে অনেক কিছুর।

(চলবে)

এ কথা কি সত্যি? শান্তি দে

তোমরা হয়তো জানো না, আমাদের এই বাংলার মাটিতে একটা গাছ আছে, সকালে মানুষ ও পশুদের মত যেমন দাঁড়িয়ে থাকে; তেমনি বিচিত্র সে রাত্রে (গাছটি) ঘুমোয়, অর্থাৎ শুয়ে পড়ে। এ কথা সত্যি। তুমি জান কি! গাছটি নাম করা পীঠস্থানের কাছে। অবশ্য সেজন্য অনেকেই ওটাকে ভগবানের মতন পুজো করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটার ওপর এখন রিসার্চ করছেন।

* * * *

এ খবরটা তোমাদের অনেকেরই জানা আছে। কারণ ৬ মাস আগে যে শিশু দুটি এক সঙ্গে দেড় বছর পিঠে জোড়া লাগা অবস্থায় ছিল। যমজ ভাই দুটি এখন এক সঙ্গে খেলা করে।

* * * *

এক সঙ্গে দুটো মাছেরই মুখ আছে। দুটো মুখ দিয়েই খেতে পারে। এটা এখন ভারতের বোম্বাইয়ের অ্যাকুরিয়ামে রাখা আছে।

* * * *

অনেকেই দেখে থাকবে ছটা আঙ্গুল। পা দুটোর পাশে আরও একটা পায়ের পাতায় মোট ১৫টা আঙ্গুল। লম্বায় চওড়ায় তিনি সুপুরুষ। পাটা—নিয়েই বিভ্রাট।

* * * আগামী সংখ্যায় আরও মজার খবর।

খেলাধুলার পাতা

কলকাতার ফুটবল লীগ প্রায় শেষ হয়ে এল। এ-রকম জোলো লীগ এর আগে খুব একটা হয় নি। তাই এবার মাঠে ভীড় কম। সমর্থকদের দৌরাত্ম্যও তেমন নেই। হবেই বা কি করে। ফুটবল উত্তেজনার খেলা। তা সে খেলাতে উত্তেজনা না থাকলে আর রইল কি!

এবারের ফুটবল এমন হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটা কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য '৮২-র এশিয়াড ও নেহরুগোল্ড-কাপ। এশিয়াড ও নেহরু গোল্ডকাপে বহিরাগত দলগুলোর খেলা দেখে কলকাতার খেলা আর মন ভরায় না। প্রথম নেহরু গোল্ডকাপ, বিশ্বকাপ প্রভৃতি খেলাগুলো মনে এমন ছাপ রেখে গেছে যার সঙ্গে তুলনায় কলকাতার লীগ খেলা ম্লান হয়ে গেছে।

তার ওপর আছে ঝগড়া অব্যবস্থা। মরশুমের শুরুতেই দু'দুটো বড় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমটি ছিল মোহনবাগান ও মহামেডান, দ্বিতীয়টি ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান।

ধোঁট পাকাল মহামেডান। তারা এবার সন্তু ফেডারেশন কাপ জিতেছে। প্রথমেই দু-দুটো চ্যারিটি খেলতে মহামেডান অস্বীকার করল। তারা বলল, আগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা হোক, প্রতিবছর আমরা প্রথম বড় খেলা খেলব না।

তাদের আপত্তি আই-এফ-এ মানল না। ফলে দুটো বড় খেলা মহামেডান না খেলায় ওয়াক ওভার হয়ে গেল ১৬ই জুলাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে খেলা ছিল একমাত্র আকর্ষণের। কিন্তু তার আগেই ইস্টবেঙ্গল চার পয়েন্ট নষ্ট করায় আকর্ষণটা হারিয়ে যায়। যা থাকে তা শুধু মর্যাদার লড়াই।

সেটুকুও উবে যায় বিশ্ব-ক্রিকেটের প্রবল উত্তেজনার বন্যায়। রাতারাতি ফুটবল পাগলরা ক্রিকেট প্রেমিক হয়ে পড়ে। চারদিকে খেলার আলোচনা বলতে একমাত্র ক্রিকেট। কেননা এমন বিস্ময়কর ঘটনার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ওই অবস্থায় ১৬ জুলাই ম্যাড়মেড়ে একটা খেলা হল। এবং সেই খেলার ফল হল ড্র। ফলে কলকাতার লীগের আকর্ষণ মরে গেল। এখন যে গতিতে

[এর পরের অংশ ১১৪ পৃষ্ঠায়]

জয় গুপ্ত

জাদু-সম্রাট ওজ-এর চিত্রকথা

ডরোথি, কাগতাড়ুয়া আর (টিনের তৈরী) তালপাতার সেপাই হাত ধরাধরি করে, গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে চলেছে পান্না-নগরের দিকে, যেখানে জাদুসম্রাট ওজ বাস করে। ডরোথির প্রিয় কুকুর টোটো ওদের আগে আগে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ ওরা এক বিকট গর্জন শুনতে পেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল চেহারার সিংহ ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের চলার পথ রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। টোটো কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে সিংহের দিকে তেড়ে গেল। সিংহটা বিরাট হাঁ করলো, যেন টোটোকে এক গ্রাসে জলযোগ করে ফেলবে।

ডরোথি ছুটে এসে সিংহকে ধমকায় —অ্যাই, খবরদার টোটোকে কামড়াবে না। লজ্জা করে না। বুড়ো ধাড়ি, ওটুকু একটা কুকুরকে কামড়াবে? ভীতু কাপুরুষ কোথাকার!—এই বলে ডরোথি এগিয়ে এসে সিংহের নাকের ওপর সজোরে একটা চড় মারলো! সামনের পায়ের একটা থাবা দিয়ে নাক ঘসতে ঘসতে সিংহ বলে—আমি তো ওকে কামড়াইনি?

ডরোথি জোর গলায় বলে—কামড়াবে বলেই তো অতো বড়ো হাঁ করেছিলে? ভীতু কাপুরুষ কোথাকার!

সিংহ লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। ধরা গলায় বলে—হাঁ, সত্যি আমি কাপুরুষ। আমার একটুও সাহস নেই। ছোট বড় সব কিছুতেই, এমন কি মাঝে মাঝে নিজের ছায়া দেখেই ভয় পাই! অথচ লোকে বলে আমি নাকি পশুরাজ! যদি বিন্দুমাত্র সাহস থাকতো……!

সবাই চুপ! কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কাগতাড়ুয়া তার খড়ে ভর্তি মাথার ন্যাকড়ার আবরণের ওপর

চুলকোতে চুলকোতে বলে, আমরা তিন জনেই যাচ্ছি জাদুসম্রাট ওজ-এর কাছে পান্না-নগরে। আমার মাথা তো খড়ে ভর্তি—ঘিলু নেই তো মগজ পাবো কোথায়? জাদুসম্রাট ওজ যদি আমায় মগজ দিতে পারে, তাহলে তোমাকেই বা সাহস দিতে পারবে না কেন? যাবে আমাদের সঙ্গে?

সিংহ তৎক্ষণাৎ রাজি।—আমি যদি সাহস পেয়ে যাই, তাহলে আমি সত্যি সত্যি পশুরাজ হতে পারবো।

ব্যস। এবার ওরা চারজন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চললো, পান্না-নগরের দিকে। সঙ্গে টোটো তো আছেই।

টোটো ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার পিছিয়ে আসছে। ওরা চার 'বন্ধু'—ডরোথি, কাগতাড়ুয়া, টিনের তৈরী তালপাতার সেপাই আর 'ভীতু কাপুরুষ'

সিংহ নাচতে নাচতে, গান করতে করতে চলেছে পান্না-নগরের দিকে, হলদে ইঁট বাঁধানো সড়ক ধরে। রাত হলে কোন গাছের তলায় ওরা বিশ্রাম করে। ডরোথি ঘুমোয়, সিংহ ঝিমোয়। আর দুজন পাহারা দেয়। তেষ্টা পেলে ঝরণার জল, খিদে পেলে গাছের ফলমূল খায় ডেরোথি। সিংহ ছোটখাটো পশু শিকার করে।

চলতে চলতে ওরা এলো এক ক্ষেতের ধারে। যতদূর চোখ যায় বাদামী রঙের ফুল ফুটে রয়েছে ছোট ছোট গাছে। একটা মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভরে আছে। ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়েছে ওরা—জানে না এটা আফিম চাষের ক্ষেত। আফিমের মাদক গন্ধে সব আগে নেশা ধরে টোটোর। সে ক্ষেতের মধ্যেই শুয়ে পড়ে। ডেরোথিও ক্রমে নেতিয়ে পড়ে। কাগতাড়ুয়া আর তালপাতার সেপাই বলে ওঠে—সর্বনাশ! এতো আফিমের ক্ষেত! ডরোথি, টোটো, সিংহ সবাই নেশায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ডেরোথিকে শিগগির সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, টোটোকেও। তারপর সিংহকে। ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে চেয়ার বানিয়ে ডেরোথিকে আর টোটোকে তুলে নেয়। আফিম ক্ষেতের শেষে একটা ঝর্ণা

পেরিয়ে ওরা ওপারে এসে ডেরোথির মুখে চোখে জলের ঝাপটা দেয়। ডোরাথি আর টোটোর জ্ঞান ফিরে আসে, ঝিমুনি ভাবটা কাটেনি। ওরা দুজনে চলে যায় সিংহের কাছে। সিংহের ভারী দেহটা নাড়াচাড়া করার শক্তি ওদের নেই! কি হবে?

চিন্তিত মনে ডেরোথির কাছে ফিরে যাচ্ছে তালপাতার সেপাই। কিছু দূর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা ছোট মেঠো ইঁদুর ধরবার জন্যে ছুটে আসছে একটা বন-বিড়াল। তালপাতাকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে। একটা ছোট্ট ইঁদুরকে মারতে যাচ্ছে বেড়ালটা—আবার তেড়ে আসছে? তালপাতা তার কুড়ুল দিয়ে এক কোপে বন-বিড়ালটার মাথা কেটে ফেলে!

'অনেক অনেক ধন্যবাদ'—মিন-মিনে গলায় কে বলে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তালপাতা দেখে সুন্দর পোশাক পরা সেই ছোট্ট মেঠো ইঁদুরই কথা বলছে।

তালপাতা বিস্মিত হয়! বলে, আমি তো টিনের তৈরী সেপাই! হৃদয় বলে কিছু নেই, দয়ামায়া কাকে বলে জানি না। তবু ঐ ধেড়ে বন বিড়াল একটা পুঁচকে ইঁদুরকে মেরে খেয়ে ফেলবে, সেটা বরদাস্ত করতে পারি নি।

জমকালো পোশাক পরা ইঁদুরটি রাগ না করে ভারিক্কি গলায়

বলে, এই পুঁচকে ইঁদুর হলো, মেঠো ইঁদুরদের রাণী। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হতুম। মনে হচ্ছে তোমার কি একটা সমস্যা রয়েছে!

তালপাতা বলে, প্রণাম মহারাণী। সমস্যাটা খুবই কঠিন। আমাদের বন্ধু পশুরাজ সিংহ আফিমের ক্ষেতে নেশার ঘোরে অচৈতন্য, আফিমের গন্ধ শুঁকে। ওখান থেকে তাকে বয়ে নিয়ে আসা আমার আর কাগতাড়ুয়ার শক্তিতে কুলোয় নি। এর কি ব্যবস্থা আপনি করতে পারবেন

মহারাণী?

ইঁদুর-রাণী তীব্র শিষ দিয়ে কি যেন বলে উঠলো। তারপরই দেখা গেল হাজার হাজার ইঁদুর —ধেড়ে, পুঁচকে, ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের ইঁদুর হাজির হ'ল সেখানে। প্রত্যেকের

মুখে এক টুকরো করে শক্ত দড়ি। ইঁদুর রাণী বলে, যাও, গাছের ডালপালা দিয়ে একটা গাড়ি বানাও। তারপর ঠেলেঠুলে গাড়ির ওপর সিংহকে তুলে দাও। আমার ইঁদুররাও সাহায্য করবে। তারপর গাড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ওরাই টানতে টানতে গাড়িটাকে

ওদিকে নিয়ে যাবে। তোমরাও পেছন থেকে ঠেলবে।

যেমন বলা তেমনই কাজ। তালপাতা কুড়ুল দিয়ে গাছের ডালপালা কেটে এনে গাড়ি বানিয়ে ফেলে। পশুরাজকে গাড়িতে তোলা হল। ইঁদুর—ঘোড়ারা গাড়িটা টানতে টানতে ঝর্ণার ওপারে যেখানে ডরোথি আছে সেখানে নিয়ে এল।

ইঁদুর-রাণী বলে, তোমাদের সাহায্য করতে পেরে আমরা সবাই খুশী। এখন তাহলে চলি। আবার যদি দরকার হয়, ডেকো মাঠে দাঁড়িয়ে। আমরা আসবো।

আগামী সংখ্যা

বেরুচ্ছে সেপ্টেম্বরের গোড়ায়

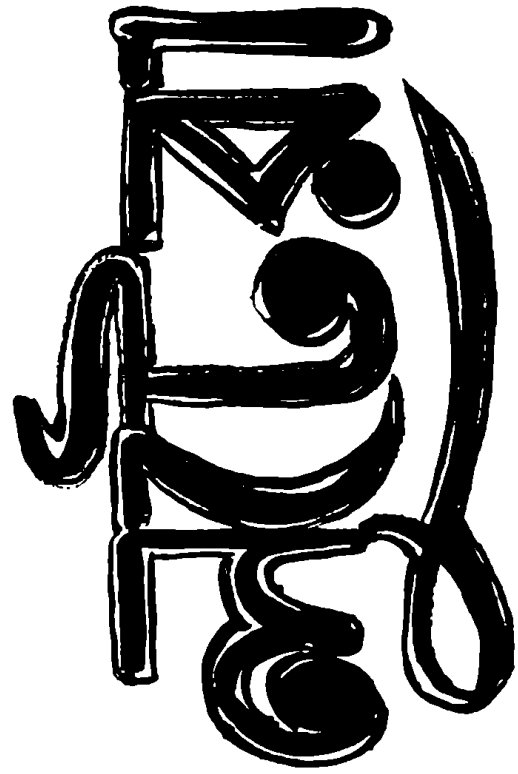

অদ্রীশ বর্ধন

* (দ্য স্টোরী অফ দ্য লেট
মিঃ এলভেসহ্যাম)

কাহিনীটা লিখে যাচ্ছি স্রেফ পরোপকারের মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার মতো আর কেউ যেন ফাঁদে পা না দেয়। আমার দুর্গতির কাহিনী পড়ে যেন পাঁচজনে উপকৃত হয়। আমার যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর জন্যে তৈরী হচ্ছি।

জানি, অবিশ্বাস্য এই কাহিনী পড়ে মুচকি হাসি হাসবেন প্রত্যেকেই। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস করানোর প্রত্যাশা নিয়েও কলম ধরিনি। উদ্দেশ্যটা স্রেফ পরোপকার—আমার মতো হাল আর যেন কারো না হয়।

এবার শুনুন আমার নাম ধাম বাবা কাকার পরিচয়। এডোয়ার্ড জর্জ ইডেন, এই নামে আমি ধরায় আগমন করেছিলাম খুবই মন্দ কপাল নিয়ে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ট্রেন্টহ্যামে। বাবা চাকরী করত ওখানকার বাগানে। মাকে হারিয়েছি তিন বছর বয়েসে, বাবাকে পাঁচ বছরে। ছেলের মতো করেই মানুষ করেছিল কাকা জর্জ ইডেন। বিয়ে-থা করেনি কাকা। উচ্চ শিক্ষিত। পেশায় সাংবাদিক। বার্মিংহ্যামে চিনত সবাই। শিক্ষার বীজ, উচ্চাশার নেশা ভালভাবেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার ভেতরেও। মারা যাওয়ার সময়ে উইল করে

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যায় আমার নামে। সবার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেখা গেল তার পরিমাণ পাঁচশ পাউণ্ড। উইলে একটাই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল কাকা! লেখাপড়া শেষ করার পর যেন টাকাটা খরচ করি। ডাক্তারী পড়ব বলে তখন মনস্থ করে ফেলেছি। স্কলারশিপের টাকায় আর কাকার সম্পত্তির জোরে ভর্তি হয়ে গেলাম লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ডাক্তারী ক্লাশে। তখন থাকতাম ১১এ, ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটের বাড়িতে ওপরতলার যাচ্ছেতাইভাবে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটা ছোট্ট ঘরে। কানাকড়ির হিসেব রেখে অত্যন্ত মিতব্যয়ী থাকব, এই অভিলাষে ছোট্ট এই ঘরখানাতেই থাকা, খাওয়া, শোয়া, পড়া —একাধারে সবই চালিয়ে যেতাম।

একদিন বগলে পুরোনো একজোড়া জুতো নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে মুচির কাছ থেকে মেরামত করে আনব বলে, এমন সময়ে দেখলাম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ চেয়ে আছে দরজার নম্বরের দিকে। নম্বর সঠিক কিনা বুঝতে পারছে না। চৌকাঠ পেরিয়েই পড়লাম একেবারে বুড়োর সামনেই। মুখখানা হলদেটে। জীবনে কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার সারা জীবন এখন জড়িয়ে গেছে এই বুড়োর জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিলভাবে।

দরজা খুলে বেরোতেই বৃদ্ধর চোখ পড়ল আমার মুখের ওপর। নিষ্প্রভ ধূসর চোখ কিনারার দিকে লালচে। আমাকে দেখা মাত্র মুখখানা ঢেউ-খেলানো করোগেটেড টিনের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল মধুর আপ্যায়নের ভঙ্গিমায়।

"যাক, এসে গেছেন। বাড়ির ঠিকানাটা একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। বলুন আছেন কেমন, মিঃ ইডেন?"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। চিনি না শুনি না, কিন্তু এমন সাদর সম্ভাষণ করে বসলেন যেন সাত জন্মের চেনাশুনা। বগলের বুটজোড়ার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখে মেজাজটাও গেল খিঁচড়ে। সুতরাং পাল্টা ভদ্রতা অবশ্যই দেখাইনি।

বুড়ো তা লক্ষ্য করে বললে—"ভাবছেন এ আবার কে? বন্ধু, বন্ধু—বলেই মেনে নিন। কেমন? আমাকে আপনি দেখেননি ঠিকই কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি। কোথায় কথা বলা যায় বলুন তো?"

দ্বিধায় পড়লাম, আমার নিজের ঘরের যা ছিরি, কোন অজানা অচেনা মানুষকে সেখানে বসানো যায় না।

তাই বললাম—"চলুন না হাঁটা যাক।"

"রাস্তায় তো? কোন্‌দিকে বলুন?"

টুপ করে বুটজোড়া নামিয়ে নিলাম ফুটপাতে।

বুড়ো বললে—"এসেছি তো বাজে কথা বলতে। লাঞ্চ খেতে খেতে বলা যাবে' খন। বুড়ো হয়েছি, গলার আওয়াজ তো ফাটা বাঁশির মতো, গাড়ি-ঘোড়ার, যা আওয়াজ—"

বলে, আমার বাহু স্পর্শ করেছিল বুড়ো, যাতে অমত না করি। লক্ষ্য করলাম, হাত কাঁপছে—

বুড়োর পয়সায় খেতে মন চায়নি। ক্ষীণ আপত্তি করেছিলাম। বুড়ো শোনেনি। পাকা চুলকে একটু শ্রদ্ধা জানালে ক্ষতি কী? রাজী হয়ে গেলাম যুক্তি শুনে।

দুজনে গেলাম ব্র্যাভিট্‌স্কি'র হোটেলে। এমন খাসা খানা অনেকদিন খাইনি। খেতে খেতে যখন কাজের প্রশ্ন করলাম, সুকৌশলে এড়িয়ে গেল বুড়ো। চেহারাটা দেখে নিলাম বেশ খুঁটিয়ে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো। মুখ সরু। চামড়া কুঁচকোনো।

দাঁত বাঁধানো। শিথিল ঠোঁট ঝুলছে বাঁধাই দাঁতের ওপর। সাদা চুল খুবই পাতলা আর লম্বা। আমার যা বিরাট শরীর, বেশীর ভাগ লোকই সে তুলনায় বামন বললেই চলে। সুতরাং বুড়োর ছোটখাট আকৃতি দেখে খুব একটা মাথা ঘামালাম না। কাঁধ গোল। একটু কুঁজো।

লক্ষ্য করলাম, আমার ওপরেও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে বুড়ো। চাহনি যেন লোভাতুর। এরকম অদ্ভুত লোভ-চকচকে চোখ বড় একটা দেখা যায় না। আমার বৃষস্কন্ধ, আমার রোদেজ্বলা হাত, আমার ফুটফুটে দাগযুক্ত মুখ—সবই যেন লোভের উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছে বৃদ্ধের চোখে।

খাওয়া শেষ হ'ল, সিগারেট ধরিয়ে বুড়ো বললে—"এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্রথমেই বলে রাখি, বয়স আমার খুবই বেশী—অথর্ব বলতে যা বোঝায়, তাই। কিন্তু আমার টাকা আছে। ছেলেপুলে নেই। ভাবনাটা সেই কারণেই, এত টাকা দিয়ে যাবো কাকে?"

এ-সব চালাকি আমার জানা আছে। পাঁচশ পাউণ্ড না বেহাত হয়। সাবধান হয়ে গেলাম ততক্ষণাৎ।

বুড়ো কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে গাওনা গেয়ে গেল নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের। বড় একা, বড় একা। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না পেলে এত সম্পত্তি দেবে কাকে? নানা পরিকল্পনা এসেছিল মাথায়—কিন্তু খারিজ করেছে একটার পর একটা। দাতব্য প্রতিষ্ঠান, স্কলারশিপ, সমাজসেবী সংস্থা, লাইব্রেরী—সব নাকচ হয়ে গেছে মনে মনে তৌল করার পর।

"শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি," আমার মুখের ওপর খর নজর নিবদ্ধ রেখে বলেছিল বৃদ্ধ— "নওজোয়ান কাউকে দিয়ে যাবো আমার বিপুল সম্পত্তি। এমন একজন যুবাপুরুষ চাই যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, যার মন নির্ভেজাল, যে গরীব কিন্তু দেহমনে স্বাস্থ্যবান। হ্যাঁ, আবার বলছি, এই রকম একটি ছেলেকেই দিয়ে যাব আমার যা কিছু আছে- স-ব। ঝঞ্ঝাট-মুক্ত হব তখনি—কিন্তু আমার টাকায় সে উচ্চ

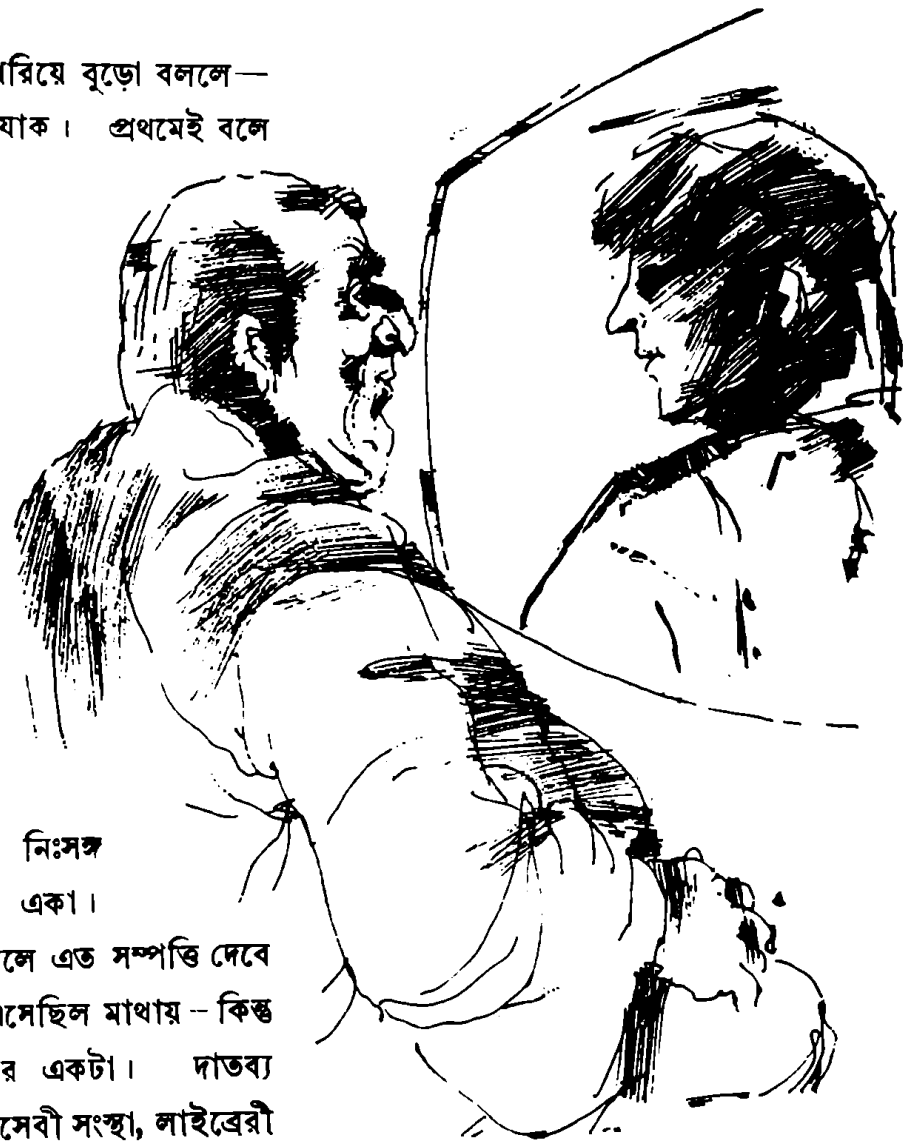

শিক্ষা পাবে, প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করবে, স্বাধীন জীবন যাপন করবে।"

এমন ভান দেখানোর চেষ্টা করলাম যেন আমার কোন আগ্রহই নেই। ছলনাটা নিতান্তই স্বচ্ছ যদিও। কাষ্ঠ হেসে বলেছিলাম—"আমাকে দিয়ে সেইরকম একটা ছেলে খুঁজে বার করতে চান, এই তো?"

ছলনা যে ধোপে টিকল না তা বুড়োর হাসি দেখেই বুঝলাম। সিগারেটে লম্বা টান মেরে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললে—"কয়েকটা শর্ত অবশ্য থাকবে। প্রথম, আমার নাম তাকে নিতে হবে। কিছু না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়? দ্বিতীয়, সে যে যে পরিস্থিতিতে যে যে মহলে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সব কিছুর মধ্যে আমাকেও রপ্ত করে দিতে হবে। বাজিয়ে নেব ভাল করেই। জানব তার বংশ পরিচয়, জানব কি ভাবে মারা গেছেন তার বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুর মা। এমন কি তার চরিত্রের যে-দিকটা পাঁচজনকে না জানিয়ে করা হয়—তাও জানব।"

"সে রকম ছেলে বলতে কি আমাকেই—"

"হ্যাঁ, বাবা, তোমাকেই!"

জবাব দিতে পারলাম না। মন-ময়ূর তখন পাখা মেলে ধরেছে। কল্পনার রথ তখন উড়ে চলেছে। বলবার মতো ভাষা এল না মুখে।

কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকার পর বলেছিলাম আমতা আমতা করে—"কিন্তু দুনিয়ায় এত ছেলে থাকতে আমাকেই—"

"প্রফেসর হ্যাসলারের কাছে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তোমার স্বাস্থ্য, চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সবই নিরেট। নির্ভরযোগ্য। সততা আর স্বাস্থ্য যার মধ্যে আছে, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে একমাত্র সে-ই। তুমিই সেই ছেলে।"

বুড়োর সঙ্গে সেই আমার প্রথম মোলাকাৎ। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, রহস্যের আবরণে ঘিরে রেখে দিয়েছে নিজেকে। নাম বলেনি। দু চারটে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল—বেশী নয়। বিদায় নিল ব্ল্যাভিটস্কি'র গাড়ি-বারান্দা থেকে। লাঞ্চের দাম মিটিয়ে দিয়েছিল পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বার করে। কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বলেছিল, দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট থাকা চাই। চাহিদাটা বড়ই অদ্ভুত। খটকা লেগেছিল তখনি। সেইদিন বৃদ্ধের ইচ্ছেমত মোটা টাকার জীবনবীমা করিয়েছিলাম। ডাক্তারদের চুলচেরা পরীক্ষা সত্ত্বেও খুশী হয়নি বুড়ো। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডক্টর হেণ্ডারসনকে দিয়ে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাজিয়ে নিয়েছিল। পরের সপ্তাহের শুক্রবারে নিয়েছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। ডাক শুনে নেমে এলাম নিচে। দেখলাম, বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে ম্যাড়মেড়ে গ্যাস-লণ্ঠনের তলায়। ছায়ামায়ায় বিদঘুটে হয়ে উঠেছে শীর্ণ মুখখানা! প্রথম দিন যতখানি কুঁজো দেখেছিলাম, সেদিন দেখলাম আরো বেশী। তোবড়ানো গাল তুবড়েছে আরো খানিকটা।

চাপা আবেগে কাঁপা গলায় বলেছিল—"ইডেন, সবই তো মনের মতো হল—এবার তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। তার আগে একটু উৎসব করে নেওয়া যাক—আজ রাতেই—আর দেরী না—একদম না।....."

বলতে বলতে কুঁজো দেহটা দুমড়ে গেছিল কাশির ধমকে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে, হাড় বার করা আঙুলে আমার বাহু খামচে ধরে টেনে নিয়ে

গিয়েছিল রাস্তায়। ছ্যাকড়া গাড়ি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছিল আমাকে নিয়ে, ঝড়ের মতো গাড়ি খেয়ে গিয়েছিল রিজেন্ট স্ট্রীটের খানদানী রেস্তোঁরায়। সেদিনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য জ্বল জ্বল করছে মনের মধ্যে। গ্যাসের লণ্ঠন, তেলের বাতি, বিজলী আলো সাঁৎ-সাঁৎ করে বেরিয়ে গিয়েছিল দুপাশ দিয়ে। জনবহুল পথেও গাড়ি উড়ে যাচ্ছিল যেন পক্ষীরাজের মতো।

দারুণ খানা খেয়েছিলাম রেস্তোঁরায়। আমার সাদামাটা পোশাকের দিকে সুবেশ ওয়েটারের তীর্যক চাহনি প্রথমটা একটু দমিয়ে দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল পেটে শ্যাম্পেন পড়তেই। ফিরে এসেছিল আত্মবিশ্বাস। নিজের কথা দিয়েই কথাবার্তা শুরু করেছিল বৃদ্ধ। গাড়িতে আসবার সময় বলেছিল নিজের নাম। স্কুলে পড়বার সময়েই শুনেছিলাম সেই নাম। বিরাট দার্শনিক। এগবার্ট এলভেসহ্যাম, ছেলে-বেলা থেকেই যার বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পড়েছে আমার ওপর, যার জীবনদর্শন নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে বিলক্ষণ, বিখ্যাত সেই ধীশক্তিটি কৃশকায় অপটু জীর্ণ দেহে আমার এত সান্নিধ্যে এসেছে জেনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। স্মরণীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে হতাশ হয় অনেকেই—আমার হতাশা উপলব্ধি করতে পারবে তারাই। কথার তোড়ে অনেক কথাই বলে গেছিল বৃদ্ধ। আয়ু তো প্রায় শেষ, প্রাণবহ্নি নিভু নিভু—কোনো-রকমে টিকিয়ে রাখা জীবনধারা ধূ-ধূ মরু হয়ে যাবে সর্বস্ব আমাকে দান করার পর। বাড়ি, লেখার স্বত্ব, জমানো টাকা, নানা ব্যবসায়ে লগ্নী করা অর্থ—সমস্ত এবার থেকে হবে আমারই। দার্শনিকরা যে এত বড়লোক হয়, আগে জানা ছিল না। আমার খাওয়া এবং মদ্য পান—দুটোই ঈর্ষার চোখে নিরীক্ষণ করে গেছেন বৃদ্ধ। বলেছিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে—"বাঁচবার সামর্থ আছে বটে তোমার—তবে বেশী দিন থাকে না কিছুই।" দীর্ঘশ্বাসের ধরনটা আমার কাছে মনে হয়েছিল একটু অন্য রকমের। যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে আছে বৃদ্ধ।

শ্যাম্পেন খেয়ে আমার মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। বলেছিলাম সোল্লাসে—"কিন্তু ভবিষ্যৎ তো আছে। উজ্জ্বলতর হবে সেই ভবিষ্যৎ আপনার কৃপায়। আপনার নাম ব্যবহারের সম্মান পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? আপনার গৌরবময় অতীতও হবে আমার ভবিষ্যতের পাথেয়।..."

তোষামুদে তারিফ শুনে যেন একটু বিষণ্ণভাবেই মাথা নেড়ে ক্ষীণ হাসি হেসেছিল বুড়ো। বলেছিল —"ভবিষ্যৎ কি পালটাতে পারবে? আমার নাম নিতে তোমার আপত্তি নেই, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিতেও দ্বিধা নেই, কিন্তু পারবে কি আমার বয়সের ভার মাথায় নিতে?"

"আপনার সমস্ত কীর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাতো নেবই," বলেছিলাম বুক চিতিয়ে।

ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। হেসে সুপেয় সুরার অর্ডার দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বার করে হলদেটে কাঁপা আঙুলে মোড়ক খুলতে খুলতে বলেছিল—"এর মধ্যে আছে আমার অপ্রকাশিত জ্ঞানের একটুখানি। অর্ডার দিলাম 'কুমেল'-এর —এই জিনিস একটু ছিটিয়ে দাও তার মধ্যে—দেখবে "কুমেল' হয়ে গেছে 'হিমেল'।"

'কুমেল' এক জাতীয় উৎকৃষ্ট আসব। যে জিনিসটা ছিটিয়ে দেওয়ার জন্যে মোড়ক খুলে দেখালে, সেটা একটা গোলাপী গুঁড়ো। শেষ কথাটা বলতে বলতে মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে চেয়ে রইল

আমার মুখের দিকে।

সুরার সৌরভ নিয়েও এত বড় দার্শনিক মাথা ঘামায়, ভাবতে গিয়ে মনে মনে আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু মদের নেশা সত্ত্বেও বুড়োর সৌরভ-বাতিক নিয়ে তোষামোদ করতে ছাড়িনি।

গোলাপী গুঁড়ো দুভাগ করে দুটি মদিরাপাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপরেই আচমকা এমন মর্যাদাগম্ভীর ভঙ্গিমায় সুরাপাত্র বাড়িয়ে তুলেছিল আমার দিকে যে, থতমত খেয়ে অনুকরণ করেছিলাম আমিও। টুং করে ঠোকাঠুকি লেগেছিল দুই গেলাসে। "উত্তরাধিকার বর্তাক অবিলম্বে," বলেই গেলাস তুলেছিল ঠোঁটের গোড়ায়।

"না, না" দ্রুতস্বরে বাধা দিয়েছিলাম আমি।

থমকে গিয়েছিল বৃদ্ধ। সুরাপাত্র নেমে এসেছিল চিবুকের তলায়। দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল আমার ওপর।

আমি বলেছিলাম—"কামনা জানাই দীর্ঘ জীবনের।"

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল বৃদ্ধ।

পরক্ষণেই অট্টহেসে বলেছিল—"তাই হোক, কামনা জানাই দীর্ঘজীবনের।"

দুজনে দুজনের চোখে চোখে চেয়ে খালি করে দিয়েছিলাম গেলাস। চোঁ-চোঁ করে চুমুক দেওয়ার সময়েও দেখেছিলাম বুড়োর চোখ নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। গেলাসখালি হতেই অদ্ভুত তীব্র একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। বিচিত্র সেই অনুভূতির প্রথম পরশেই তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। খুলির মধ্যে কোষগুলো যেন সত্যিসত্যিই লাফালাফি জুড়েছে মনে হয়েছিল। কানের মধ্যে শুনেছিলাম একটানা গুঞ্জন-ধ্বনি। সুরার স্বাদ পাইনি জিভে অথবা গলায়, সৌরভে মুখ-গলা

ভরে গেলেও তার উপলব্ধি ঘটেনি—বুড়োর ধূসর অনিমেষ চাহনির তীব্রতা যেন পুড়িয়ে দিয়েছিল আমার সত্তা। এক চুমুকেই শেষ করেছিলাম পাত্র। কতটুকুই বা আর সময় লাগে তাতে? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যেন অনন্তকাল ধরে চুমুক দিয়েই চলেছি মাথার মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ডও অব্যাহত রয়েছে অনন্তকাল ধরে। দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মগজের প্রতিটা কোষ যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়েছে করোটির মধ্যে, চিন্তাবুদ্ধি সব কিছুই ঘোলাটে—আবিলতা কাটছে না কিছুতেই। চৈতন্য লোপ পেলেও পাচ্ছেনা—অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় আবছাভাবে শুধু মনে আছে যেন বিস্তর অর্ধ-বিস্মৃত ঘটনা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে চেতনার কিনারা ঘিরে। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অস্ফুট অবস্থাতেই।

সম্মোহনের ঘোর ভঙ্গ করল বৃদ্ধ নিজেই। আচম্বিতে পাঁজর-ভাঙা দমকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নামিয়ে রাখল গেলাস।

বললে—"কেমন বুঝছো?"

"অপূর্ব!" সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে না পেরেও বলেছিলাম মুহ্যমানের মতো।

মাথায় তখন চর্কিপাক দিচ্ছে। বসে পড়েছিলাম ধপ করে। প্রলয়-কাণ্ড চলছে ব্রেনের মধ্যে,

এইটুকুই কেবল উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম হাড়ে-হাড়ে। একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল অনুভূতি। ফাঁপা, বক্র, অবতল আয়নায় যেভাবে সবকিছুই ক্ষুদে-ক্ষুদে ভাবে দেখা যায়, মনে হয়েছিল সেইরকমই দেখছি সামনের দৃশ্য—কাছে থেকেও যেন দূরে সরে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। বুড়োর হাবভাবেও পরিবর্তন এসেছে। ধড়ফড় করছে অত্যন্ত নার্ভাসভাবে। চেনে বাঁধা ঘড়ি টেনে বার করল হন্তদন্ত ভঙ্গিমায়। এক পলক দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এখুনি না বেরোলেই নয়। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। আরেকজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভাড়াটে গাড়িতে উঠে বসার পর নিজের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—"গুঁড়োটা তোমাকে না খাওয়ালেই হতো। কাল তো মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক কাজ করো। এই গুঁড়োটা নাও। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে খেয়ে নিও, কেমন? শুতে যাওয়ার আগে কিন্তু —খেয়াল থাকে যেন।"

বলে একটা সাদা প্যাকেট গছিয়ে দিল আমার হাতে। অনেকটা সিডলিজ পাউডারের মতো দেখতে। যা নাকি মৃদু জোলাপ হিসেবে খাওয়া হয়। বুড়োর ঝুলে পড়া চোখের পাতা দেখে বুঝলাম, আমার মতোই অবস্থা হয়েছে নিজেরও। প্যাকেট হাতে গছিয়ে দিয়ে 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই হাত খামচে ধরে আমিও বিদায় জানিয়েছিলাম সোল্লাসে। গাড়ি-ছাড়ার আগের মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে বুক-পকেট হাতড়ে শেভিংস্টিকের মতো একটা ছোট চোঙা বার করে গুঁজে দিলে আমার হাতে—"ছাখো দিকি কাণ্ড। একেবারে ভুলে গেছিলাম। কাল তো আবার দেখা হবে—তখন খুলো—তার আগে নয়। কেমন?"

ঘড়ঘড় শব্দে বেরিয়ে গেল গাড়ি। পুঁচকে চোঙাটা হাত পেতে নিয়েছিলাম আলগোছে—আর একটু হলেই হাত ফস্কে পড়ে যেত রাস্তায়। দারুণ ভারী। সীসের না, প্লাটিনামের? দুপাশে আর মাঝখানের জোড় বরাবর লাল গালা লাগানো।

সযত্নে বস্তুটা রাখলাম পকেটে। মাথার মধ্যে চাকা ঘুরছে তখনো। ঐ অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করলাম রিজেন্ট স্ট্রীট দিয়ে। রাস্তার লোক কি ভাবল কে জানে। চলেছি আপন মনে। অন্ধকার গলি খুজি পেরিয়ে এলাম পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে। হাঁটছি যেন আফিংয়ের ঘোরে। কে জানে গোলাপী গুঁড়োটা সত্যিই আফিং কিনা। হাঁটার সময়ে যা যা অনুভব করেছিলাম, এখনো তা সুস্পষ্ট মনে আছে। আফিং খাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে তো কখনো হয়নি। মনটা যেন দু-ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অনুভূতিটা কি করে বোঝাই ভেবে পাচ্ছিনা। রিজেন্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন যেন বলতে চাইল ওয়াটারলু স্টেশনে এসে গেছি—ট্রেনে ওঠা দরকার। চোখ রগড়ে নিয়ে দেখলাম, আরে গেল যা, রিজেন্ট স্ট্রীটেই তো হাঁটছি, বোঝাতে পারলাম কী? পাকা অভিনেতা যেন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছিলাম—কটমটে চাহনির সময়ে জোর করে যা ছিলাম, তাই হয়ে গেলাম। রিজেন্ট স্ট্রীটকে রিজেন্ট স্ট্রীট মনে হতেই মনের মধ্যে ভীড় করে এল সৃষ্টিছাড়া অনেক স্মৃতি, মনেমনে ভাবলাম—'ত্রিশ বছর আগে এইখানেই ঝগড়া করেছিলাম ভাইয়ের সঙ্গে। হো-হো করে হেসে উঠেছিলাম। ফ্যাল-ফ্যাল করে পাশের

পথচারীরা চেয়েছিল আমার দিকে। ত্রিশ বছর আগে তো জন্মই হয়নি আমার—ভাই-টাইও নেই কস্মিনকালে। গোলাপী গুঁড়োর মাহাত্ম্য কি অপরিসীম! ভাই যে একটা ছিল, এই চিন্তাটা কিন্তু জাঁকিয়ে বসল মাথার মধ্যে এর পরেও। পোর্টল্যাণ্ড রোড দিয়ে যাওয়ার সময়ে নতুন মোড় নিল পাগলামি। মনে পড়ল এমন অনেক দোকানের কথা যা অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তা আগে যা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম বর্তমান রাস্তার চেহারা। আবিল চিন্তাধারার পুরোনো স্মৃতি ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিলে অন্যান্য অনেক স্মৃতিও। ঘাবড়ে গেলাম খুবই। ভূতুড়ে স্মৃতির আনাগোনায় আরও গুলিয়ে গেল মাথা। স্টিভেন্স-এর দোকানের সামনে পৌঁছোতেই খেয়াল হল কি যেন একটা কাজ ছিল দোকানটায়, কিন্তু মনে করতে পারছি না কিছুতেই। সশব্দে একট বাস বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে, আওয়াজটা মনে হল অবিকল চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আগামী কাল তিনটে ব্যাঙ পাঠানোর কথা ছিল স্টিভেন্স-এর। আশ্চর্য! এই সহজ ব্যাপারটা ভুলে মেরে দিয়েছিলাম!

একটার পর একটা স্মৃতি-দৃশ্য ভৌতিক ছায়ার মতো মনের মধ্যে ঠেলে উঠেই হটিয়ে দিচ্ছে আর একটা অপছায়ার মতো স্মৃতিকে। স্মৃতি আর স্মৃতি! কোনোটাই আমার জীবনে কখনো ঘটেনি—অথচ তা আমার স্মৃতিই মনে হচ্ছে। হুটোপাটি করছে মনের মধ্যে।

চেনা রাস্তা ছেড়ে কখন যে অন্য পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, সে খেয়ালও ছিল না মাথার মধ্যে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলায়। ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটে পৌঁছোনোর পর বাড়ির নম্বর মনে পড়ল না। অনেক চেষ্টার পর ২১এ নম্বর মনে পড়ল বটে, কিন্তু বেশ মনে হল, আর কেউ যেন নম্বরটা বলেছে আমাকে—আমার নিজের বাড়ির নম্বর আমারই মনে নেই—অন্যে মনে করিয়ে দিয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে ডিনার খাওয়ার ঘটনাগুলো মাথায় আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই বুড়োর মুখটা আনতে পারলাম না মনের মধ্যে। আবছা ছায়ার মতো একটা আকৃতি বার বার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল স্মৃতির পর্দায়। ঠিক যেন কাঁচের সার্সিতে প্রতিফলিত কারো মুখ দেখছি। বুড়োর মুখের বদলে দেখলাম নিজের অদ্ভুত রকমের বাহ্য আকৃতি। টেবিলে বসে উজ্জ্বল চোখে রাঙা মুখে বকর বকর করে চলেছি বিষম উৎসাহে। "অসম্ভব! অন্য গুঁড়োটা এবার খাওয়া দরকার। আর তো পারা যাচ্ছে না।" বলেছিলাম নিজের মনেই।

হলঘরে ঢুকে দেশলাই আর মোমবাতি খুঁজলাম যেদিকে, সেদিকে দেশলাই আর মোমবাতি কখনো থাকে না। সিঁড়িতে উঠে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোন তলায় রয়েছে আমার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলাম। মাতাল হয়েছি নিঃসন্দেহে। নইলে হোঁচট খাব কেন?

ঘরে ঢুকেই অচেনা লাগল সব কিছুই। জোর করে বশে আনলাম মনকে। উদ্ভট চিন্তাভাবনা তাড়ালাম মন থেকে। চেনা-চেনা মনে হল। ঘরখানা। ঐ তো আয়না—কোণে সাঁটা কাগজ। ঐ তো চেয়ার—মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে জামাকাপড়। তা সত্ত্বেও বেশ মনে হল, জোর করে চেনবার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু আমি যেন সেই মুহূর্তে বসে রয়েছি রেলগাড়িতে। গাড়ি থামল একটা স্টেশনে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি একটা অচেনা প্ল্যাটফর্মের দিকে।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি পেয়ে গেলাম নাকি হঠাৎ? নাঃ। কালকেই চিঠি লিখতে হবে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে।

খাটে বসে বুট খুললাম পা থেকে। বেশ বুঝছি, আমার এই বর্তমান অনুভূতি আঁকা রয়েছে আর একটা অনুভূতির ওপর। সেই অনুভূতিটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আসতে চাইছে ওপরে।

একই সঙ্গে দু-জায়গায় থাকাতো যায় না। জামা-কাপড় অর্ধেক খুললাম, অর্ধেক পরেই রইলাম। পাউডারটা গেলাসে ঢেলে দিতেই ভুস্‌ভুস্‌ করে বুদবুদ উঠল কিছুক্ষণ দ্যুতিময় অম্বর রঙে রঙীন হয়ে উঠল জল। গলায় ঢেলে দিলাম তৎক্ষণাৎ। বিছানায় শোওয়ার সময়ে বুঝলাম, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বালিশটা মাথার তলায় লাগাতে না লাগাতেই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছিলাম। অদ্ভুত জানোয়ারদের স্বপ্ন। মন ভারাক্রান্ত। নামহীন আতঙ্কে বুক তোলপাড়। মুখ বিস্বাদ। হাত-পা অবশ। চামড়ায় অস্বস্তিকর শিহরণ। শুয়ে রইলাম বালিশে মাথা দিয়ে। অস্বস্তি আর আতংকের ভাবটা কেটে গেলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। কিন্তু তা হ'ল না। বেড়েই চলল রহস্যজনক অপার্থিব অনুভূতি। চারপাশের খাপছাড়া দৃশ্য প্রথমে ধরতে পারিনি। মৃদু আলো রয়েছে ঘরে—প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। তাল তাল তমিস্রার জায়গায় রয়েছে আসবাবপত্রগুলো। চাদরের ওপর দিয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম সেইদিকে।

মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকেছে। মানিব্যাগ নিয়ে চম্পট দেওয়ার মতলব। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর বুঝলাম, আশংকাটা মনের ভ্রান্তি। তা সত্ত্বেও খটকা গেল না মন থেকে। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছে। মুণ্ড তুলে তাকালাম ঘরের চারদিকে। যা দেখলাম

তা কল্পনাতে আনতে পারলাম না। অন্ধকার কোথাও কম, কোথাও বেশী। দেখা যাচ্ছে পর্দা, টেবিল, ফায়ার প্লেস, বইয়ের তাক এবং আরও অনেক কিছু। তার পরেই দূরের অন্ধকারের মধ্যে অচেনা অপরিচিত অনেক কিছুই দেখতে পেলাম। খাট ঘুরে গেল নাকি? বইয়ের তাক হতে পারে দূরের ঐ জমাট অন্ধকার, কিন্তু তার পাশে যা দেখছি, সেটাতো আমার চেয়ার নয়। চেয়ারের চেয়ে অনেক বড়।

ছেলেমানুষী আতংকে গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়ালাম খাট থেকে নামব বলে। কিন্তু মাটিতে পা ঠেকা দূরের কথা, তোষকের কিনারা পর্যন্ত পা পৌঁছোলো না। এগিয়ে গিয়ে বসলাম খাটের ধারে। খাটের পাশেই থাকা উচিত মোমবাতি, ভাঙা চেয়ারের ওপর দেশলাই। হাত বাড়ালাম। হাতে ঠেকল না কোনোটাই। প্রায়ান্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে হাত ঠেকলো ভারী মত একটা বস্তুতে। খস্ খস্ আওয়াজ হল হাত দিতেই। খামচে ধরে টান দিতেই বুঝলাম খাটের মাথায় ঝুলছে পর্দা।

ঘুমের জড়তা তখন কেটে গেছে। বেশ বুঝলাম, অজানা অচেনা একটা ঘরে বসে আছি। ঘাবড়ে গেলাম। গতরাতের ঘটনাগুলো মনে করলাম। অবাক কাণ্ড! সুস্পষ্ট মনে করতে পারলাম। খাওয়া, হাতপেতে মোড়ক নেওয়া, নেশাখোরের মত হাঁটাচলা, আধখেঁচড়াভাবে জামাকাপড় খোলা, বালিশে মাথা দেওয়ার পর নিবিড় প্রশান্তি। বিশ্বাস করতে পারলাম না নিজেকেই। গতকালের ঘটনা, না, পরশুরাতের ঘটনা? চুলোয় যাক, এ ঘরটা তো আমার নয়—এলাম কি করে? আবছা আঁধার আরও পাতলা হয়ে আসছে, জানলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, খড়খড়ি দিয়ে যেন ভোরের আলো ঢুকছে। ডিম্বাকৃতি কাঁচটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতেই বড় কাহিল মনে হল নিজেকে। টলছি। কাঁপা হাত সামনে বাড়িয়ে জানলার দিকে এগোতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেল একটা চেয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ায়। কাঁচে হাত বুলোলাম। বেশ বড় কাঁচ। হাতে ঠেকল বাহারি ঝুলন্ত দীপাধার—পেতল নির্মিত। খড়-খড়ির দড়ি খুঁজলাম। পেলাম না। হাত ঠেকলো ঝুমকোয়। টান মারতেই খট করে খড়খড়ি উঠে গেল ওপরে।

যে দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, তা কখনো দেখিনি। আকাশ মেঘে ঢাকা। ভোরের আবছা আলো মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। রক্ত-রঙীন হয়ে উঠেছে মেঘস্তূপের কিনারা আকাশের প্রান্তে। নিচে অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়, মসীকৃষ্ণ মহীরুহ, আবছা বাড়ির সারি। জানলার তলায় কালোঝোপ, ফিকে ধূসর পথ। স্বপ্ন দেখছি নাকি? এসব তো কস্মিনকালেও দেখিনি! প্রসাধন টেবিলে হাত বুলোলাম। পালিশ করা কাঠ। সাজানোয় ত্রুটি তো নেই-ই, বরং বাহুল্য আছে। ছোট ছোট কাট-গ্লাসের শিশি রয়েছে বিস্তর। রয়েছে একটা বুরুশ। আরও একটা অদ্ভুত বস্তু হাতে ঠেকলো। ঘোড়ার খুরের মত আকার। মসৃণ। খোঁচা দুটো বেশ শক্ত। জিনিসটা রয়েছে একটা প্লেটের ওপর। দেশলাই পেলাম না। মোমবাতিও পেলাম না।

আবার চোখ বুলোলাম ঘরময়। খড়খড়ি খোলা থাকায় আলো আসছে বলে দেখতে পেলাম, চারদিকে ঝোলানো পর্দা দিয়ে ঢাকা বিরাট একটা খাট, খাটের পায়ের দিকে ঝকঝকে সাদা মার্বেল পাথরের মতো বস্তু দিয়ে তৈরী ফায়ারপ্লেস।

প্রসাধন টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে

ফের চোখ খুলে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন নয়। একেবারে বাস্তব। গত রাতের নেশার ঘোর বোধহয় কাটেনি। রাতারাতি সম্পত্তির দখল নিয়ে ফেলেছি—এই পাগলামিটাই নেশার ঘোরে অবাস্তবকে বাস্তবের মতো নিশ্চয় তুলে ধরেছে চোখের সামনে। নিজের ঘরদোর সব ভুলেমেরে বসে আছি। সবুর করলেই নিশ্চয় আবার মনে পড়বে। বৃদ্ধ এলভেসহ্যামের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার স্মৃতিটা তো কিন্তু বেশ জ্বলজ্বলে। শ্যাম্পেনের স্বাদ, ওয়েটারের তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনি, গোলাপী গুঁড়ো, কড়া মদ—সবই বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। যেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা।

তারপরেই ঘটল একটা তুচ্ছ কিন্তু ভয়ংকর ঘটনা। এখনো ভাবতে গিয়ে গা কাঁপছে। স্বগতোক্তি করেছিলাম—বেশ জোরেই।

"কি মুস্কিল! এলাম কোন্ চুলোয়?" ···কণ্ঠস্বর কিন্তু আমার নয়!

না, সে কণ্ঠস্বর কখনোই আমার নয়! অত সরু গলা আমার নয়। উচ্চারণ জড়িত। মুখের হাড়ে স্বরের অনুরণন অন্য ধরনের। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এক হাত দিয়ে আরেক হাত বুলিয়েছিলাম। হাতে ঠেকেছিল শিথিল চামড়া—ভাঁজ খাওয়া কুঁচকোনো চামড়া, হাড়ের ওপর সেঁটে থাকা চামড়া। স্বপ্ন। নিঃসন্দেহে স্বপ্ন দেখছি! গলা তাই বিকৃত, চামড়াও খসখসে মনে হচ্ছে! হাত বুলিয়েছিলাম মুখে, দাঁত নেই। আঙুল ঠেকেছিলো শুকিয়ে-যাওয়া মাড়িতে। ঘিন ঘিন করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ।

আয়নায় দেখা দরকার মুখখানা। টলতে টলতে গেছিলাম ম্যান্টেলের দিকে। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে ভয়ানক কাশির ধমকে প্রাণ যায় আর কি। খামচে ধরেছিলাম ফ্লানেলের রাত্রিবাস। আমার গায়ে ফ্লানেলের রাত্রিবাস?

দেশলাই পাইনি। খুব শীত করছিল। নাক বুঁজে আসছিল। কাশতে কাশতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। টলতে টলতে খাটে উঠে পড়েছিলাম। "স্বপ্ন দেখছি! স্বপ্ন দেখছি!" খাটে উঠতে উঠতে বলেছিলাম গোঙানির স্বরে। অথর্ব বৃদ্ধরাই কিন্তু এইভাবে এক কথা বার বার বলে। চাদর মুড়ি দিয়ে জোর করে চোখে ঘুম টেনে আনার চেষ্টা করেছিলাম। ঘুমোলেই স্বপ্ন উধাও হবে। ভোরের আলোয় চিনতে পারব চেনা ঘরকে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তা হয় নি। ঘুমোতে পারি নি। পরিবর্তনটা ধীর গতিতে কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়ে বসছিল মনের মধ্যে। অব্যাখ্যাত রহস্যজনক পন্থায় আমি রাতারাতি বুড়িয়ে গেছি। যৌবন হারিয়েছি—হারিয়েছি শক্তি, সামর্থ, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। প্রতারিত হয়েছি রাতারাতি—ঠকবাজের হাতে সঁপে দিয়েছি আমার জীবন আর যৌবনের অমূল্য সম্পদ। অজান্তেই আবার শীর্ণ আঙুল বুলিয়েছিলাম কুঁচকে যাওয়া মাড়িতে। ভ্রান্তি নয়। সত্যি, নিষ্ঠুর সত্যি।

স্পষ্টতর হয়েছিল ভোরের আলো। ঘুমের চেষ্টা বাতুলতা বুঝে উঠে বসেছিলাম। হিমশীতল উষালোকে স্পষ্ট দেখেছিলাম ঘরের সব জিনিস। পেল্লায় ঘর। ফার্নিচারও বিস্তর। রুচিসম্মত। জীবনে এমন ঘরে ঘুমোই নি। এককোণে নিচু তেপায়ার ওপর মোমবাতি আর দেশলাই দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়েছিলাম খাট থেকে। ভোরের ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ—অথচ তখন গরমকাল। মোমবাতি জ্বালিয়েছিলাম। কাঁপা হাতে মোমবাতি ধরে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম—

এলভেসহ্যামের মুখ!

এই আতংকটাই আবছাভাবে জড়িয়ে রেখেছিল এতক্ষণ আমাকে।

এলভেসহ্যামের শীর্ণকায় চেহারা আগেও দেখেছি—

—তখন গায়ে ছিল ধড়াচূড়া। এখন দেখলাম অনাবৃত অবস্থায়। রাত্রিবাস খসে পড়ায় সরু গলা আর হাড় বার করা বুক দেখে শিউরে উঠেছিলাম। তুবড়োনো গাল। লম্বা নোংরা সাদা চুল, ঘোলাটে চোখ। শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট কাঁপছে থিরথির করে। নিচের শিথিল ঠোঁটের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালচে মাড়ি। সমবয়সীরা উপলব্ধি করবেন আমার মানসিক অবস্থা। পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম স্বাধীনতা হারিয়ে সহসা বন্দী হয়েছি এক জরাকম্পিত বৃদ্ধের জীর্ণ খাঁচায়—আয়ু যার নিঃশেষিত।

মূল কাহিনী থেকে কিন্তু সরে আসছি। ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া আচমকা দেহ-পরিবর্তন নিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল চিন্তা করার ক্ষমতা। জানি না কোন যাদুমন্ত্রবলে এক দেহ থেকে আরেক দেহে যাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু অব্যাখ্যাতভাবে ঠিক তাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে। এলভেসহ্যামের পৈশাচিক মৌলিকতার নগ্নরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের মধ্যে। আমি যেমন তার দেহে ঢুকে বসে আছি, নিঃসন্দেহে এলভেসহ্যামও ঢুকে পড়েছে আমার দেহে—আমার ভবিষ্যৎ, আমার শক্তি এখন তারই দখলে। কিন্তু তা প্রমাণ করা যায় কি করে?

সম্ভাবনাটা এমনই অসম্ভব যে যাচাই করার জন্যে আবার চিমটি কেটেছিলাম চামড়ায়, আঙুল বুলিয়েছিলাম মাড়িতে, আয়নায় দেখেছিলাম মুখখানা। ঘটনা কিন্তু ঘটনাই থেকেছে। এমন জীবন-মরীচিকাও কি সম্ভব? সত্যিই কি আমি হয়েছি এলভেসহ্যাম, আর এলভেসহ্যাম হয়েছে আমি? ইডেনকে স্বপ্ন দেখছি না তো? ইডেন বলে সত্যিই কেউ কখনো ছিল কী? বেশ তো, আমি যদি এলভেসহ্যামই হই, তাহলে মনে থাকা উচিত গতকাল সকালে ছিলাম কোথায়, আছি কোন্ শহরে এবং কি কি ঘটেছিল স্বপ্ন শুরুর আগে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলাম চিন্তার সঙ্গে। গতরাতে দুটো স্মৃতি হুড়োহুড়ি করেছিল মনের মধ্যে। এখন মন পরিষ্কার। আসল ইডেনের কোনো স্মৃতিকেই টেনেটুনে তুলে আনতে পারলাম না মনের পর্দায়।

"যত্তো সব পাগলামি!" ফাটা বাঁশির মতো সরু গলায় চিৎকার করে উঠে টলতে টলতে দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম মুখধোওয়ার বেসিনের সামনে, ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ছিলাম মাথার সাদা চুল। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে আবার ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। বৃথা চেষ্টা। নিঃসন্দেহে আমি ইডেনই ছিলাম—এলভেসহ্যাম নয়। ইডেন কিন্তু এখন বন্দী রয়েছে এলভেসহ্যামের শরীরে!

অন্য বয়সের মানুষ হলে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতাম নিজেকে। মন্ত্রের কাজে জারিজুরি খাটে না, অতএব হাল ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করতাম। কিন্তু এ যুগটা যাচাই করে নেওয়ার যুগ। অলৌকিক বা দৈব ঘটনা এ-যুগে পাত্তা পায় না। অতএব পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয় মনোবিজ্ঞানের কারসাজি। ওষুধ খাইয়ে আর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে যা ঘটানো যায়, তার উলটোটা ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে অন্য ওষুধ খাইয়ে আবার নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে পারলে। স্মৃতি-লোপের ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু স্মৃতি বিনিময়ের ঘটনা কেউ কখনো শোনে নি! হাসতে

গিয়ে বুড়োটে কেশো হাসি বেরিয়ে এসেছিল গলা দিয়ে। বুড়ো এলভেসহ্যামও নিশ্চয় আমার দুরবস্থা কল্পনা করে হাসছে এই মুহূর্তে। ভাবতেই প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলাম দপ্ করে—অথচ এরকম রাগে অগ্নিশর্মা হওয়ার ধাত আমার নয়। জামাকাপড় পরতে গিয়ে মেঝে থেকে যা কুড়িয়ে পেলাম তা সান্ধ্যপোশাক। ওয়ার্ডরোব খুলে বার করলাম সেকেলে ট্রাউজার্স আর ড্রেসিং গাউন। সাদা মাথায় বুড়োটে টুপি চাপিয়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এলাম চাতালে।

তখন বোধ হয় পৌনে ছ-টা। বাড়ি নিস্তব্ধ। সব জানালাতেই খড়খড়ি বন্ধ। চাতালটা বেশ চওড়া। দামী কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান নেমে গেছে নিচের তলার অন্ধকার হলঘরে। সামনেই খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেখবার টেবিল, ঘোরানো বুককেস, চেয়ারের পেছনদিক আর মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত তাক বোঝাই সারি সারি চমৎকার বাঁধানো কেতাব।

"আমার পড়ার ঘর", বিড়-বিড় করে বলে খোলা দরজার দিকে এগিয়েই থমকে গিয়েছিলাম কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওঠায়। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে নকল দাঁতের পাটি মাড়িতে বসিয়ে অভ্যস্ত কায়দায় কামড় বসাতে খাপেখাপে বসে গেছিল বাঁধাই দাঁত।

লেখবার টেবিলের সবড্রয়ারেই চাবি দেওয়া। ওপরে খাড়াই ঘোরানো অংশটাতেও চাবি দেওয়া। চাবি কোথাও নেই—এমন কি আমার প্যাণ্টের পকেটেও নেই। শোবার ঘরে পা টেনে টেনে গিয়ে সবকটা জামাপ্যাণ্টের পকেট হাতড়ালাম। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হল যেন চোর ঢুকেছিল। ঘরময় ছত্রাকার জামাপ্যাণ্টের কোনো পকেটেই নেই চাবি, নেই টাকাপয়সা, নেই একচিলতে কাগজ—গতরাত্রের ডিনার খাওয়ার বিলটা ছাড়া।

বসে পড়েছিলাম। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম প্রত্যেকটা টেনে বারকরা জামাপ্যাণ্টের দিকে। প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি তখন নিভে গেছে। নিঃসীম নিরাশায় ভেঙে পড়েছি। প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি শত্রুর বিপুল বুদ্ধিমত্তা, হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি কতখানি অসহায় আমি। জোর করে উঠে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিলাম পড়ার ঘরে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খড়খড়ি টেনে তুলছিল একজন পরিচারিকা। আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধ-হয় চেয়ে রইল চোখ বড়বড় করে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুল্লি খোঁচানোর লোহার ডাণ্ডা মেরে ভাঙতে লাগলাম লেখবার টেবিল। চুরমার হয়ে গেছিল টেবিলের ওপরদিক, খসে পড়েছিল তালা, খুপরি থেকে চিঠিপত্র ছিটকে পড়েছিল ঘরময়। রগচটা বৃদ্ধের মতোই কলম ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, দোয়াত উলটে দিয়েছিলাম, লেখবার হাল্কা সরঞ্জাম সমস্ত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে-ছিলাম। ম্যাণ্টেলের ওপর বিরাট একটা ফুল-দানিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল—কিভাবে তা বলতে পারব না। তছনছ করেও পাইনি চেকবই, টাকা অথবা আমার দেহ ফিরিয়ে আনার কোনো নিদর্শন। ড্রয়ারগুলো পিটিয়ে তক্তা করার সময়ে দুজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে খাসভৃত্য ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

সংক্ষেপে, এই আমার দেহ পরিবর্তনের গল্প। ছিট-গ্রস্তের এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি কি তা জানি না? পাগল হয়ে গেছি, তাই নাকি নজরবন্দী আমি। কিন্তু পাগল যে হয়নি, তা প্রমাণ করার জন্যেই কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেছি এই কাহিনী লিখব বলে। কিছু বাদ দিলাম না—

[এর পরের অংশ ১০৭ পৃষ্ঠায়]

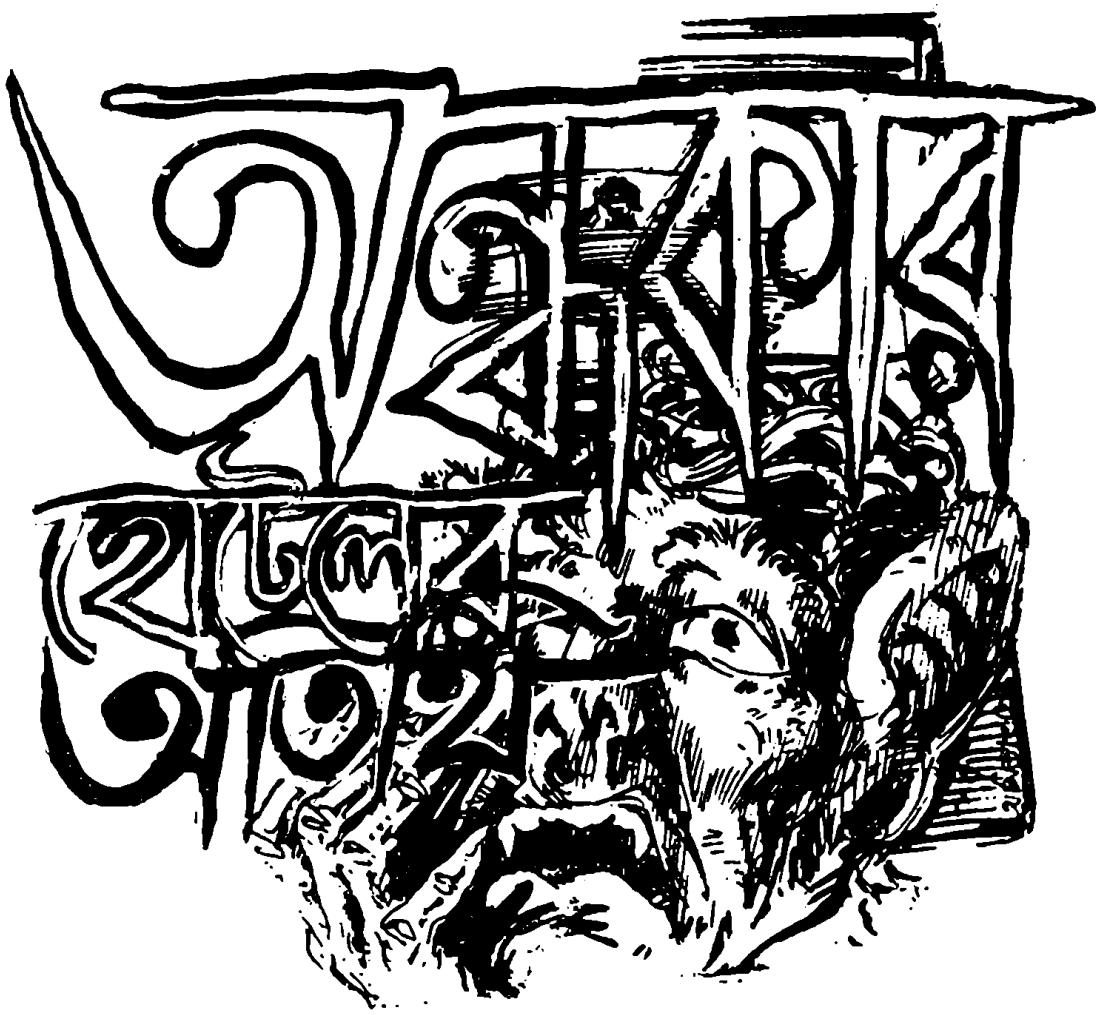

রহস্যময় রায়

গোড়ার কথা : ওরা তিন ভাইবোন রডারিগ ডেমিংগো আর ক্যারোলিন। দাদুর চিঠি পেয়ে ওদের মাথায় মতলব এল তিনজনে গাড়িতে সোজা পাড়ি দেবে গোলাঞ্জনগরের দিকে। ব্যাপারটাও দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হবে। পালা করে গাড়ি চালাবে দুই ভাই। ক্যারোলিন শুধু ওদের সঙ্গ দেবে। ওরা যাবে বলে তৈরী ঠিক সেই সময় কোয়েলো মামা এসে হাজির। মামাও সঙ্গে যাবে। চারজনেই তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় বেশ বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ি রাস্তা উঁচু নিচু ঢাল নেমেছে। রাত হয়ে এসেছে, কুয়াশা, তার পরে বৃষ্টি তারই সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। এত অন্ধকারে গাড়ি চালাতে বেশ ভয় হচ্ছিল। সামনে কোন আশ্রয় পেলে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যেত। সামনে কোথাও কি কোন হোটেল আছে? বছর পনের আগে এ রাস্তায় একবার এসেছিল ক্যারোলিন। স্মৃতিতে গোলাঞ্জনগর কাছে বলে মনে হচ্ছে।

কোয়েলো মামা হঠাৎ বললেন দেখ দেখ সামনে পথ দুদিকে গেছে। গাড়ি থামলো জোড়া পথের

মুখে। হঠাৎ নজরে পড়ল রাস্তার ধারে খুঁটির গায়ে আটকানো একটা লম্বা টিনের মধ্যে কি লেখা। টর্চ জ্বেলে দেখলো। অক্ষরগুলো পড়া যাচ্ছে না তবে তীর চিহ্ন আঁকা। বৃষ্টি পড়ছে, শিল পড়তে আরম্ভ করল। ওরা খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে এগোতে লাগল। মাঝ পথে থেমে থেকে লাভ নেই। হঠাৎ ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। সবাই চমকে উঠল। স্টিয়ারিং থেকে ডেমিংগোর হাত সরে গিয়ে গাড়ি প্রায় পথের বাইরে চলে গিয়ে ছিল। আজ যেন রাতটা কেমনতর।

ক্যারোলিন বললো, দেখো ওখানে জমির শেষে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না? হোটেল নয় তো? কিন্তু সব তো অন্ধকার, বাড়িতে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির হেড লাইটে দেখা গেলো 'ভ্যালিভিউ ট্যাভার্ন' হোটেল। নেম প্লেট সাইন-বোর্ড ঝড়ের বাতাসে দুলছে। ট্যাভার্নের দরজা বন্ধ তবু ওদের মনে খুব আনন্দ হলো। আজ রাতটা গরম গরম খাবার খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাটবে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত যাওয়াই মুস্কিল। ছাতা চাই, তা না হলে বৃষ্টিতে সবাই ভিজে যাবে। ছাতা চাই।

ছাতা ওদের যা আছে তা মালের সঙ্গে গাড়ির পিছনে বন্ধ। কি করে ওরা এখন হোটেলে যাবে? ডেমিংগো গাড়ির হর্নটা টিপে ধরল। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে কোঁ করে বেজে উঠল হর্ন। ওরা ভাবল, এ শব্দে নিশ্চয়ই হোটেল-ওয়ালার ঘুম ভাঙবে। তা হলেই সে ছাতা নিয়ে আসবে। কিন্তু বার বার হর্ন বাজিয়েও কোথাও কোন মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। হোটেল-ওয়ালা না হয় ঘুম কাতুরে, কিন্তু হোটেলের সব যাত্রীরাই কি তাই! কোয়েলো মামা ব্যাজার মুখ করে বললেন, 'এমন ঝড়-জলের রাতে কে আর জেগে থাকে বল? আমি গিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছি।'

'যাবেন কি করে আপনি?' রডারিগ জিজ্ঞাসা করল।

'বুদ্ধি খরচ করে।' বলে পিছনে জানলার উপরে জড়ো করে রাখা শার্ক স্কিনের জামাটা তুলে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেললেন। বললেন, 'টর্চটা দাও তো। দেখি কারও ঘুম ভাঙ্গাতে পারি কি না।'

উনি ট্যাভার্নের গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই আবার চারদিকে চমক দিয়ে কোথায় যেন বাজ পড়ল। আবারও চমকে উঠল সবাই। ভীষণ ভয় পেয়ে রডারিগ বুকের উপরে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। কোয়েলো মামা দরজায় ধাক্কা দিলেন। দুমদুম দুম। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। বেশ জোরেই আবার উনি ধাক্কা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, আমরা বাইরে ভিজছি।' কথার শেষে দরজায় হাত রাখতেই ক্যাচ করে শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেল। দরজার ফাঁক আড়াল করে দাঁড়াল এক চিমসে বুড়ো, গাল তোবড়ান তার। কোটরে বসা চোখে কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি। থেমে থেমে, টেনে টেনে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'কজন যাত্রী?' কোয়েলো মামার মনে হল কথাগুলো যেন পাতাল থেকে এল।

"আমরা চারজন। সঙ্গে ভাগনী আছে, দুটো ঘর পেলে ভাল হয়।'

'যাবেন কোথায়?' হোটেলের বুড়ো জিজ্ঞাসা করল। লোকটার গলায় কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন কোয়েলো মামা। এদিকে একশ মাইলের মধ্যে গোলাঞ্জ নগর ছাড়া যে আর কোনও জায়গা নেই তা তো ম্যাপে দেখেছেন

উনি। তবে এ লোকটা এমন কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? কি জানি, অন্য কোনও জায়গা কোথাও থাকতে পারে, ভাবলেন উনি। বললেন, 'যাব আমরা গোলাঞ্জনগর। এত বৃষ্টি বলে থামতে চাই।'

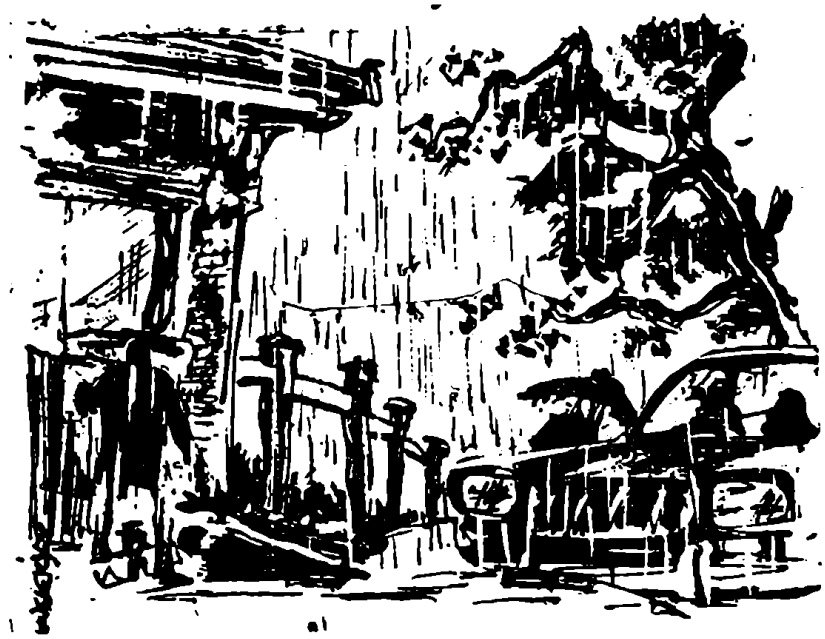

'আসুন আপনারা।' বলে বুড়ো ভিতরে চলে গেল। মামা ভাবলেন নিশ্চয়ই আলো জ্বালতে গেলেন উনি। কিন্তু দুটো ছাতা চাওয়া হল না তো। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো ছাতা পরপর ধপাস ধপাস করে এসে পড়ল ওর পায়ের কাছে। লোকটা অন্ধকারের ভিতর থেকেই যেন ছুড়ে দিল ছাতা দুটো। বেজায় অবাক হলেন মামা। কিন্তু তখন আর অত ভাবার সময় ছিল না ওঁর। ছাতা দুটো তুলে নিয়ে জামাটা আবার মাথার উপরে চাপিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন উনি। গাড়ির কাছে এসে ছাতা দুটো গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা এসো। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিও। আমার শীত-কাঁপুনি ধরেছে। আমি ভিতরে যাচ্ছি।' কথার শেষে উনি ছুটেই চলে গেলেন বারান্দার দিকে ফের।

ছাতা হাতে তুলে নিয়ে ক্যারোলিন বলল, 'অ্যাঃ কি নোংরা মাকড়শার জাল লেগে রয়েছে ছাতা-গুলোর গায়ে। দশ বছর যেন এগুলো ব্যবহার করা হয়নি।'

'এখন ঝড় জলে কেউ বোধ হয় আসেনা এদিকে।' বলল ডেমিংগো, 'রডারিগ তুই গাড়িতে থাক। আমি লিনাকে পৌঁছে দিয়ে ছাতা নিয়ে ফিরে আসছি।'

গাড়ির দরজাগুলো আটকাতে আটকাতে রডারিগ বলল, সেই ভাল। তোরা যা আমি অপেক্ষা করছি।

দরজা খুলে, দুজনে বাইরে বার হতেই ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেল দুজনের। ছাতাগুলো সত্যিই বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি। হাতে মুখে ওদের ঝুল লেগে গেল। কাঁপতে কাঁপতে ওরা কোন মতে ট্যাভার্নের বারান্দায় উঠে পড়ল। দেখল কোয়েলো মামা ওখানে দাঁড়িয়ে রুমালে গায়ের জল মুছচেন। ওদের দেখে বললেন, ব্যাপার কি বল তো? বুড়ো এখনো আলো জ্বালছে না কেন? ভিতরে চল তো দেখি ব্যাপার কি?

'লিনা রইল মামা।' বলল ডেমিংগো, 'আমি ছাতা নিয়ে যাচ্ছি রডারিগকে আনতে। আপনারা আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করুন ততক্ষণ। আর হোটেলওয়ালাকে বলুন কিছু গরম খাবার করে দিতে।'

কথার শেষে আর দাঁড়াল না ডেমিংগো। বাড়তি ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে এগোলো গাড়ির দিকে।

বারান্দার নীচে নেমে ওর মনে হল, বৃষ্টি যেন অনেক কমেছে। কমেছে হাওয়ার বেগ। চারিদিকের জমাটবাঁধা অন্ধকারে আর তত ঝাপসা দেখাচ্ছেনা। খুশিই হল ও। যাক, তা হলে বৃষ্টি থেমে এল। গাড়ির কাছে যেতেই রডারিগ নেমে এল খোলা ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওদিকে এখনও আলো জ্বলল না কেন রে? বৃষ্টি কমল বোধ হয়। কিন্তু জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছে! হোটেলওয়ালার দেখা পেয়েছেন মামা?'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাভার্নের দিক থেকে প্রাণ হিম করা ক্যারোলিনের ভয় মেশান গলার আর্তনাদ শোনা গেল। চারদিকের অন্ধকার যেন কেঁপে উঠল তাতে। কোন কথা না বলেই দুজনে প্রাণপণে ছুটল ট্যাভার্নের দিকে। বারান্দায় উঠেই শুনতে পেল মামার গলা। উনি বলছেন, 'লিনা লিনা, ও কিছু নয় লিনা। ওটা ওখানে হঠাৎ দেখেছ বলেই ভয় পেয়েছ তুমি। আমরা সবাই আছি কোনও ভয় নেই তোমার!'

হুড়মুড় করে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে রডারিগ আর ডিমিংগো শুনতে পেল এক অচেনা গলার বিশ্রী হাসির আওয়াজ। হাসতে হাসতে সে বলল, 'ও ঘর তো ডক্টর ওয়ালডোর চেম্বার ছিল। ওটা কঙ্কাল। হাওয়ায় দুলছে। ও ঘরে ঢুকলে কেন? ভয় তো পাবেই।' কেমন যেন খ্যান খ্যানে গলা ওর।

একটা বড় হল ঘর পার হয়ে দুজনে ভিতরের এক বারান্দায় পৌঁছাল। সে বারান্দার চার পাশে ঘর। সবগুলোর দরজা বন্ধ। একটার সামনে লিনাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কোয়েলো মামা। তার সামনে রোগা চিমসে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তার যা চেহারা, দেখলেই আঁতকে উঠতে হবে।

'কি হয়েছে মামা? লিনা চেঁচাল কেন?' ডেমিংগো জিজ্ঞাসা করল।

'ও হঠাৎ ভয় পেয়েছে। ঘরের ভিতরে জানলার ধারে একটা কঙ্কাল টাঙান আছে। ও ঘরে ঢুকতেই সেটা হাওয়ায় দুলে উঠেছে। তাই।' বললেন কোয়েলো মামা। 'ও ঘরে ওকে ঢুকতে বারণ করা উচিত ছিল।' বেশ রাগ করে রডারিগ বলল, 'মালিক গেলেন কোথায়? আলো কই, আলো দেওয়া হোক, কোন কোন ঘরে থাকব আমরা?'

সেই চিমসে বুড়ো বলল, 'আলো নেই। যে ঘরে খুশি থাকুন। অন্ধকারে তো ভয় পাবেই তা না হলে অন্ধকার কেন? আমি যাই। আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

'আলো নেই মানে! আলো এনে দিন। এমন অন্ধকারে আমরা চলাফেরা করব কি করে? আলোর জন্য যদি আলাদা পয়সা দিতে হয় তো তাও দেব আমরা। দুটো লণ্ঠন দিন।' বলল ডেমিংগো।

মামা ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? সে তো এখানে নেই! অবাক কাণ্ড, এই ছিল এখানে, গেল কোথায়?'

লিনা আতঙ্ক জড়ান গলায় বলল, 'আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না মামা। কেমন যেন ভয় করছে। আমি রাতে একলা থাকতে পারব না। কঙ্কালটা এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

'বেশ তো এক ঘরেই রাত কাটাব আমরা। মনে হচ্ছে, এখানে আর কোনও যাত্রী নেই। অন্য ঘর থেকে বাড়তি খাট এনে নিলেই হবে। নাও এখন টর্চ জ্বেলে হ্যাভারস্যাক খোলো। আগে

বাতি বার কর, মোম বাতি।'

ডেমিংগো টর্চ জ্বেলে বলল, মালপত্র সব তো গাড়িতেই রয়ে গেছে মামা। ওসব আর এখন আনা যাবে না। ঘর ঠিক করুন, খাট লাগিয়ে দি। এখানে কিছু খাওয়া জুটবে বলেও মনে হচ্ছে না। চটপট শুয়ে পড়লেই এক ঘুমে রাত কাবার হবে।

'তাহলে ডান দিকের ঘরটাতেই থাকা যাক।' মামা বললেন, 'দেখ ঘরে কটা খাট আছে।'

রডারিগ এগিয়ে গিয়ে দরজার হুড়কোটা বাইরে থেকে খুলল। হাত ঝেড়ে বলল, 'এ ঘরও বহুদিন খোলা হয়নি বলে মনে হচ্ছে। এ পথে তাহলে বহু দিনই লোক চলাচল করে না।' কথার শেষে ও দরজায় ঠেলা দিল। ক্যাঁ-য়্যা-য়্যা-য়্যাচ্ করে বিশ্রী আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজার পাল্লা দুটো। ওরা তাকিয়ে দেখল, ঘরের ভিতরে জমাটবাঁধা অন্ধকার ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ ততক্ষণে ওদের নাকে পৌঁচেছে। বন্ধ ঘরের এমন গন্ধই হয়। মামা বললেন, 'তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর। টর্চটা দাও, আমি আগে ভিতরে গিয়ে দরজা জানলা গুলো সব খুলেদি, পরে তোমরা ঢুকো।'

ডেমিংগোর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সামনে ফেললেন মামা। দরজার সামনে কিছু নেই, ওদিকের দেওয়াল দেখাগেল। মাঝে ঘরের এক পাশ থেকে ওপাশ জুড়ে বিরাট মাকড়শার জালপাতা। একটা বড় মাকড়শার গায়ে আলো পড়াতে সেটা এক পাশে সরে যেতে চেষ্টা করল।

দরজাটা মামা টেনে ফের বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'পাশের ঘরে চল। এ ঘরে বহুদিন লোক বাস করে না।' পাশের ঘরের দরজাটা মামাই খুলে ফেললেন। আলো ভিতরে ফেলে বললেন, 'এতো দেখছি বেশ সাজান গোছান ঘর! বড় খাট পাতা আছে। সোফা সেট আছে। আগেরটার মত অত বেশী দিন এঘর বন্ধ ছিল না। এঘরেই আমরা থাকব। বাড়তি খাট আর তাহলে টানা-টানি করতে হবে না।' কথা বলতে বলতে উনি আলো হাতে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে জানলাগুলো খোলার শব্দ শোনা গেল। ভিতর থেকেই মামা বললেন, 'বৃষ্টি একদম থেমে গিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়াও নেই আর। বেশ ঘর খানা। তোমরা ভিতরে এসো।'

ক্যারোলিন ঘরের মধ্যে ঢুকেই বলল, 'ওঃ বাইরে দাঁড়িয়ে আমার যা ভয় করছিল মামা। এ ঘরে আর কোথাও কোন কঙ্কাল লুকান নেই তো? এবারে কঙ্কাল দেখলে কিন্তু আমার হার্ট ফেল করবে।'

কোয়েলো মামা হেসে বললেন, 'ঝড় বৃষ্টি, জমাট অন্ধকার, আর এমন ঘন ঘন বাজপড়া, সবই তো আমাদের মনের মধ্যে একটা থমথমে ভাব এনে দিয়েছিল। তার উপরে হোটেলে ঢুকেও আলো নেই। দরজা খুলে দিল একজন চিমসে বুড়ো, মনে হয় যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। ওকে দেখেই তো লিনার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে বলে, এখানে থাকব না। অমন মন নিয়ে ঘরে ঢুকেই ডাক্তার সাহেবের পোষা কঙ্কালের সঙ্গে মোলাকাত। বুঝতেই পারছ তখন কি অবস্থা ওর। সে ভয় এখনও যায় নি, তাই এখনও ঘরের প্রতি কোণে একটা করে কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছে।' কথার শেষে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন কোয়োলো মামা।

ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে খাট পাতা। বেশ বোঝা যায়, এ ঘরে যাত্রীরা থাকত না। থাকতেন হোটেলের মালিক। তা না হলে, খাট ছাড়া, সোফা সেট, রাইটিং টেবিল, চেয়ার পাতা কেন?

পাশে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে দোলার জন্য এক খাসা দোল-খাওয়া ইজিচেয়ারই বা থাকবে কেন ?

কোয়েলো মামা বললেন, 'খাটে লিনা শোবে একলা। আমি রকিং ইজিচেয়ারটায় থাকব। ডেমিংগো তুমি শোবে সোফায়। আর রডারিগ···' কথা উনি শেষ করতে পারলেন না। রডারিগ বলল, 'আমি শোব ওই লম্বা বাক্সটার উপরে। ওই যে ওটা দেওয়ালের ধারে পাতা আছে। আমাকে একটা চাদর দিলেই হবে।'

'ওটা কি ? কেন ওখানে অমন ভাবে রাখা আছে।' অবাক ক্যারোলিন জিজ্ঞাসা করল, 'ডিভান নয়। বাক্স অত বড় হয় ?'

কোয়েলো মামা বললেন, 'ওটা কি তা আর আমাদের জেনে কাজ কি ? ওটা আছে তাই রাতের সমস্যা আমাদের মিটল। খাওয়াদাওয়া জুটবে না যখন, তখন শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা কর। রাত অনেক হল।'

খাটের কাছে গিয়ে ক্যারোলিন বলল, 'উঃ কি ধুলোই না জমে আছে বিছানার ঢাকনাটার উপরে। ডেমিংগো এটা ধরতো গুটিয়ে ফেলি।'

তলা থেকে একটা মোটা চাদর তুলে নিল রডারিগ। বলল, 'ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছে। আমি শুয়ে পড়লাম। গুড নাইট।'

ডেমিংগো বলল, 'আমার বিছানা লাগবে না। সোফাতেই আরামে আমি কাটিয়ে দিতে পারব। গুড নাইট।'

কোয়েলো মামা বললেন, 'ঘরের দরজাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ছি লিনা। তুমিও শুয়ে পড়।'

কথার শেষে আওয়াজ তুলে দরজাটা মামা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, ''এদিকে আজকাল কেউ আসে না বলেই এ হোটলের এই হাল। চালু হোটেল হলে কিছু না কিছু অন্তত খেতে জুটত। যাক্‌গে, একটা রাত তো, ও কেটে যাবে। গুড নাইট।'

বিছানায় শুয়ে লিনা বলল, 'আমার কিন্তু ঘুম আসবে না মামা। আমার কেন যেন একদম ভাল লাগছে না। ওই চিমসে বুড়োটা কে ?'

'আঃ শুনতে পাবে, আস্তে বল।' বলল ডেমিংগো, 'ওকে দেখলে মনে ভয় জাগে ঠিক, কিন্তু রূপের জন্য তো কেউ নিজে দায়ী নয়। বেচারা।'

'বেচারারা কি অমন বিশ্রী ভাবে হাসে ?' কেমন করে যেন বলল লিনা।

'ও তাহলে কবর থেকে উঠে আসা প্রেত।' বলল রডরিগ, 'আর এই যে বিরাট বাক্সটার উপরে আমি শুয়ে আছি, এটা আসলে কঙ্কাল। ডাক্তার ওয়ালডোর কঙ্কাল শোওয়ানো আছে এর মধ্যে।'

ধড়ফড় করে বিছানার উপরে উঠে বসল লিনা। বলল, 'কোয়েলো মামা, আমি এখানে থাকব না, বৃষ্টি থেমেছে, চলুন গাড়ি চালিয়ে গোলাঞ্জনগরই চলে যাই।'

'এ তোমার অন্যায় রডারিগ।' বললেন মামা, 'কেন ওকে ভয় দেখাচ্ছ? অন্ধকারে হঠাৎ একটা দোল খাওয়া কঙ্কালের সামনে পড়লে তোমারও যে কত সাহস তা বোঝা যেত। এখন আর কোনও কথা নয়। সবাই শুয়ে পড়। তুমিও লিনা। ঘরে আমরা এতজন আছি, মিছিমিছি ভয় পেওনা।'

সবাই চুপ করল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে লিনাও ফের শুয়ে পড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ। গভীর রাতে কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই।

লিনার মনে তখন এক চিন্তা, রডারিগ কেন অমন কথা বলল। সত্যি যদি ওই বাক্সটার মধ্যে ডাক্তার ওয়ালডোর কঙ্কাল শোয়ান থাকে, তবে!" ওর মনে হল, অত বড় বিছানায় ওর পাশে যেন কে শুয়ে আছে। তার নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পেল যেন। সারা শরীর ওর যেন অবশ হয়ে গেল। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা হিমের স্রোত বয়ে গেল। প্রাণপণ শক্তিতে বিছানার উপরে ফের ও উঠে বসল। একলা এত বড় খাটে ও কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারবে না।

ওকে অমন করে উঠে বসতে দেখে কোয়েলো মামাও উঠে বসলেন। বললেন, 'ব্যাপার কি বল তো? আমারও যেন কেমন বিশ্রী লাগছে। বহুদিন বন্ধ থাকা ঘরের বাতাসে কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ। ঘুম আসছে না।'

ডেমিংগো বলল, 'তার থেকেও বেয়াড়া ব্যাপার মামা, কেমন যেন মনে হচ্ছে, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। ঘুম আসছে না।'

রডারিগ বলল, 'আসলে আমাদের খুব খিদে পেয়েছে তাই ঘুম আসছে না। আর ঘুম আসছে না বলেই যা তা চিন্তা মনে আসছে। আমার তো বার বার মনে হচ্ছে বড় বাক্সটার মধ্যে কে যেন এ-পাশ ও-পাশ করছে, ডালা তুলে দিলেই উঠে বসবে বহু বছরের ঘুম ভেঙ্গে।'

হুড়মুড় করে খাট থেকে নেমে পড়ল লিনা। বলল 'কে যেন আমার গায়ে নিশ্বাস ফেলল। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।' কথার শেষে লিনা সোজা এসে দাঁড়াল কোয়েলো মামার দোলানো ইজি চেয়ারের পাশে।

ডেমিংগোও উঠে বসে বলল, 'সত্যি, আমারও যেন মনে হচ্ছে·····।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় বেশ জোরে ধাক্কা পড়ল। লিনা তো সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল ভয়ে। ওর চিৎকার ছাপিয়ে বাইরে কে যেন বলল, 'খানা দেওয়া হয়েছে, খানা। আসুন দেরী করবেন না। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' অমন গলা যে কারও হতে পারে তা ভাবেনি ওরা। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরে কোয়েলো মামা বললেন, 'খাবারের ডাক পড়ল যেন? চল দেখা যাক ব্যাপারটা কি। খিদেও তো পেয়েছে বেশ।'

'কিন্তু ডাকল কে?' লিনা জিজ্ঞাসা করল।

'হোটেলের কোনও বয় হবে নিশ্চয়ই।' বলল রডারিগ, 'বর্ষা বাদলে গলায় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

কোয়েলো মামা বললেন, 'কথা না বাড়িয়ে এ ঘরের বাইরে চল তো আগে, ওদিকে খানা ঠাণ্ডা হচ্ছে শুনলে না।'

এক লাফে রডারিগ উঠে পড়ে দরজাটা খুলে ফেলল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়েই ফিরে এসে বলল, 'ও মামা, এতো দেখছি বেজায় ঠাট্টা করে গেছেন কেউ। বাইরের বারান্দা তো দেখছি তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানা দেওয়া হল কোথায়?'

'খানা হয়ত খাবার ঘরে দেওয়া হয়েছে। সে ঘরের আলো হয়ত এখান থেকে দেখা যায় না।'

বললেন কোয়েলো মামা।

'তাহলে কি সে ঘরের খোঁজে বার হব নাকি?' জিজ্ঞাসা করল ডেমিংগো।

'নিশ্চয়ই।' বললেন মামা, 'ঘরে বসে সবাই মিলে আজেবাজে চিন্তা করার থেকে খাবার ঘর খুঁজে বার করাটা অনেক কাজের কাজ হবে। চল সবাই।'

বারান্দার একদিকে গোলটেবিল পাতা। তার চারপাশে গোল করে রাখা খান কতক চেয়ার। ওটা খাবার জায়গা নয়। ওখানে বসে আড্ডা দেবার জায়গা। অন্য দিকেই সবাই এগোলো। খান দু'তিন ঘর পার হতেই দেখতে পেল একটা ঘরের দরজা খোলা। অবাক কাণ্ড, তার ভিতর থেকে কেমন যেন আলো বার হচ্ছে। সে আলোতে সব কিছু দেখা গেলেও, চারদিকের অন্ধকার কাটেনি! এমন আলোও হয়!

এই তো খাবার ঘর। খুশি হয়ে বললেন কোয়েলো মামা, 'আমি তো গন্ধ পাচ্ছি খাবারের, বেশ গন্ধ, কিন্তু এমন গন্ধ কোন খাবারের? চল চল, ঢোকো ভিতরে। দেখা যাক এ হোটেলের বাবুর্চিরা আমাদের কি খাওয়ায়।' কথা বলতে বলতে মামাই আগে ঘরে ঢুকলেন, পিছনেই লিনা। তারপর রডারিগ আর ডেমিংগো এক সঙ্গে।

কোনও সন্দেহ নেই ওটাই খাবার ঘর। তবে তা যেন কোনও বড় লোকের বাড়ির, হোটেলের নয়। এক পাশে পাতা খানা-টেবিলের উপরে নানা ধরনের খাবার সাজান। অল্প আলোতেও দেখা গেল, কটা থেকে যেন ধোঁয়া উঠছে। গন্ধ সেই সব খাবারে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওদের সামনে টেবিলের অন্য দিকে, এক হাতে কাঁটা আর অন্য হাতে ছুরি ধরে একজন মানুষ বসে আছেন। তার দৃষ্টি ওদের দিকেই। ওঁর সামনের প্লেটে তখনও কিছু পড়েনি। উনি তাহলে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোকও চাপা গলায় ডাকলেন, 'আসুন আপনারা, খানা ঠাণ্ডা হচ্ছে।' হোটেলের সবারই যেন আজ ঠাণ্ডা লেগেছে।

মহা খুশি হয়ে কোয়েলো মামা বললেন, 'যাক, তাহলে এ হোটেলে আপনিও আছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম এখানে আর কেউ নেই। কোন ঘরে আছেন আপনি? আমরা রাতে এসেছি, এই ঘণ্টা কয়েক আগে। আমার নাম ..'

কেমন করে যেন হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'জানি। জানি আপনারা সবাই আসবেন। তাইতো সারাদিন ধরে নিজে দেখাশোনা করে খানা বানিয়েছি। স্পেশাল খানা। খাবেন, খেয়েই বুঝবেন। বসুন আপনারা।'

কোয়েলোমামা বেজায় খুশি হয়ে ফিরে বললেন, 'বস, বস, বসে পড় তোমরা সবাই। খিদেও পেয়েছে বেশ। সামনে গরম খানা, আর কি দেরী করা চলে। কথার শেষে ভদ্রলোকের সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন উনি। ওর দেখাদেখি অন্যরাও বসল। লীনা বসল মামার ঠিক পাশে। ওরা বসতেই মামা একটু উঁচু হয়ে উঠে টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম অ্যালফ্যান্সো কোয়েলো। আপনার পরিচয়?

আমি? আমি ডক্টর সিলভেস্টার ওয়ালডো। আপনারা যে ঘরে আছেন, ওটা আমারই ঘর।' কথার শেষে আবারও সেই অদ্ভুত ভাবে হাসলেন ডাক্তার ওয়ালডো। মামার বাড়িয়ে দেওয়া হাত উনি ধরলেনই না। ওর হাতে চামচ ঠিক তেমনি করেই ধরা রইল।

(চলবে)

[৯৮ পৃষ্ঠার পর]

খুঁটিয়ে লিখলাম। পাঠক-পাঠিকারা পড়ে বলুন রচনাশৈলী বা বলার ভঙ্গীর মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ কিছু দেখছেন কী? এক বৃদ্ধের দেহপিঞ্জরে বন্দী এক তরুণের হাহাকার নয়কী এই কাহিনী? এতবড় একটা সত্যি ঘটনাও কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় কারো কাছেই। আমার ডাক্তারের, আমার সেক্রেটারী-দের, আমার চাকর-চাকরাণী এবং প্রতিবেশীদের নাম জানি না। খুবই স্বাভাবিক। তারা আসছে রোজ, কিন্তু যেহেতু তাদের চিনতে পারছিনা—তাই আমাকে অপ্রকৃতিস্থ ধরে নিচ্ছে। এদের চোখে তো আমি পাগলই—বদ্ধ পাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছি এদের প্রত্যেককে, কাঁদছি, গলাবাজি করছি, নিষ্ফল রাগে হাতপা ছুঁড়ছি। আমার অবস্থায় এর প্রতিটি স্বাভাবিক—ওদের কাছে অস্বাভাবিক। আমার কাছে টাকা নেই, চেকবইও নেই। ব্যাঙ্কেও আমার সই মিলবে না—কাঁপা হাতে যে-সই করব, তাতে তো মনে হয় ইডেন-এর লেখার টান থাকবেই। আমি যে নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে সব কথা বলব, সে পথও বন্ধ। এই শুভানুধ্যায়ীরা বেরোতে দিচ্ছে না। এ শহরে বোধ হয় কোনো ব্যাঙ্ক নেই—আমার অ্যাকাউন্ট রয়েছে লণ্ডনের কোনো এক পাড়ায়। ধড়িবাজ এলভেসহ্যাম নিশ্চয় নিজের আইনবিদের নামও গোপন রেখেছে বাড়ির লোকের কাছে - যাচাই করার সে পথও বন্ধ। এলভেসহ্যাম মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিল। আমার কাহিনী শুনে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, মন নিয়ে বেশী তন্ময় থাকায় মাথা বিগড়েছে এলভেসহ্যামের, মানে, আমার। নিজেকেই নাকি আর নিজে বলে চিনতে পারছিনা! দুদিন আগে ছিলাম প্রাণবন্ত যুবক—সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর আজ আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ; ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে হন্‌হন্ করে টহল দিচ্ছি বাড়িময়, রেগে টং হয়ে আছি, ভয়ে কেউ সামনে আসছেনা—দূর থেকে নজরবন্দী রেখেছে উন্মাদকে। লণ্ডনে এই মুহূর্তে পূর্ণ যৌবনের সমস্ত সুযোগ নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছে এলভেসহ্যাম—সেইসঙ্গে মগজের মধ্যে ঠাসা রয়েছে সত্তর বছরের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা। চুরি করেছে কেবল আমার জীবনটা! কিভাবে যে এ-কাণ্ড ঘটল, আজও তা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। পড়ার ঘর ভর্তি অনেক পাণ্ডু-লিপিতে দেখেছি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংক্ষেপে লিখে রেখেছে এলভেসহ্যাম, সাংকেতিক হরফে অনেক গণনাও রয়েছে—আমার কাছে সবই দুর্বোধ্য। কয়েক জায়গায় যা লিখেছে, তা পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে অংকশাস্ত্রের দর্শনবাদ নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে বিস্তর। যে জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের জন্যে এলভেসহ্যামের আসল ব্যক্তিত্ব, জীর্ণ এই মগজ থেকে তার সবটুকুই চালান করেছে আমার তাজা মগজে এবং আমার যা কিছু তা বিদেয় করেছে এই বাতিল মগজের খাঁচায়। এক কথায়, দেহ বদল করেছে বুড়ো। এ জিনিস সম্ভব হয় কি করে, তাই তো ভেবে থই পাচ্ছি না। আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। চিন্তার জগতে আমি বরাবর বস্তুবাদী। হঠাৎ এই ঘটনার পর দেখছি বস্তু থেকে ব্যক্তির সত্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব।

মরিয়া হয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করব ঠিক করেছি। মরবার আগে বসেছি সব কথা লিখে রাখার জন্যে। আজ সকালে প্রাতরাশের টেবিল থেকে একটা ছুরি দিয়ে অভিশপ্ত এই টেবিলের একটা গুপ্তড্রয়ার ভেঙে ফেলেছি। গুপ্তড্রয়ার নামেই—চোখের সামনে রেখে যেন গুপ্ত করা হয়েছে। ভেতরে পেয়েছি একটা ছোট্ট সবুজ শিশি—আর কিচ্ছুনা। শিশির মধ্যে রয়েছে খানিকটা সাদা গুঁড়ো। লেবেলে

লেখা একটাই শব্দ—'মুক্তি'। নিঃসন্দেহে বিষ। এলভেসহ্যামই রেখেছে আমার নাগালের মধ্যে লুকিয়ে রাখার আছিলায়—যাতে খেয়ে মরি এবং তার অপকর্মের একমাত্র সাক্ষীটি ইহলোক থেকে বিদায় নেয়। লোকটা যত দুরাত্মাই হোক, অমর হওয়ার পথ যে আবিষ্কার করেছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। দুর্ঘটনা না ঘটলে, আমার শরীর নিয়ে বাঁচবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। তারপর সুযোগ বুঝে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে প্রবেশ করবে আবার কোনো হতভাগ্য তরুণের দেহে। চুরি করবে তার জীবন, যৌবন, ভবিষ্যৎ। হৃদয়হীন সন্দেহ নেই··· কিন্তু আমি ভাবছি, এইভাবে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকবে কোথায়···ভাবছি, কত কাল ধরে এই ভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে বৃদ্ধ···কিন্তু আর পারছি না। ক্লান্তি বোধ করছি। সাদা গুঁড়ো জলে গুলে যায় দেখেছি। খেতেও খারাপ নয়।

মিঃ এলভেসহ্যামের টেবিলে পড়ে থাকা লেখাটার শেষ এইখানেই। মৃতদেহটা পড়েছিল চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে। শেষ মুহূর্তের খেঁচুনির সময়ে সম্ভবতঃ চেয়ার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল পেছনে। গল্পটা পেন্সিলে লেখা, হাতের লেখাও মিঃ এলভেসহ্যামের সুন্দর হস্তাক্ষরের মতো নয়। দুটো অদ্ভুত ঘটনা নথিভুক্ত করেই ইতি টানা যাক উপাখ্যানে। ইডেন আর এলভেসহ্যামের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশই নেই। কেননা, এলভেসহ্যামের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার করা হয়েছে ইডেনকে। ইডেন কিন্তু উত্তরাধিকার হয়েও হতে পারেনি। মারা গিয়েছিল এলভেসহ্যাম আত্মহত্যা করার চব্বিশ ঘণ্টা আগে—জনবহুল চৌমাথায় গাড়ি চাপা পড়ে। অত্যাশ্চর্য এই কাহিনীতে আলোক সম্পাত করতে পারত একমাত্র যে ব্যক্তি, এখন সে জেরার বাইরে।

ছবির খেলা

রূপালী সাহা

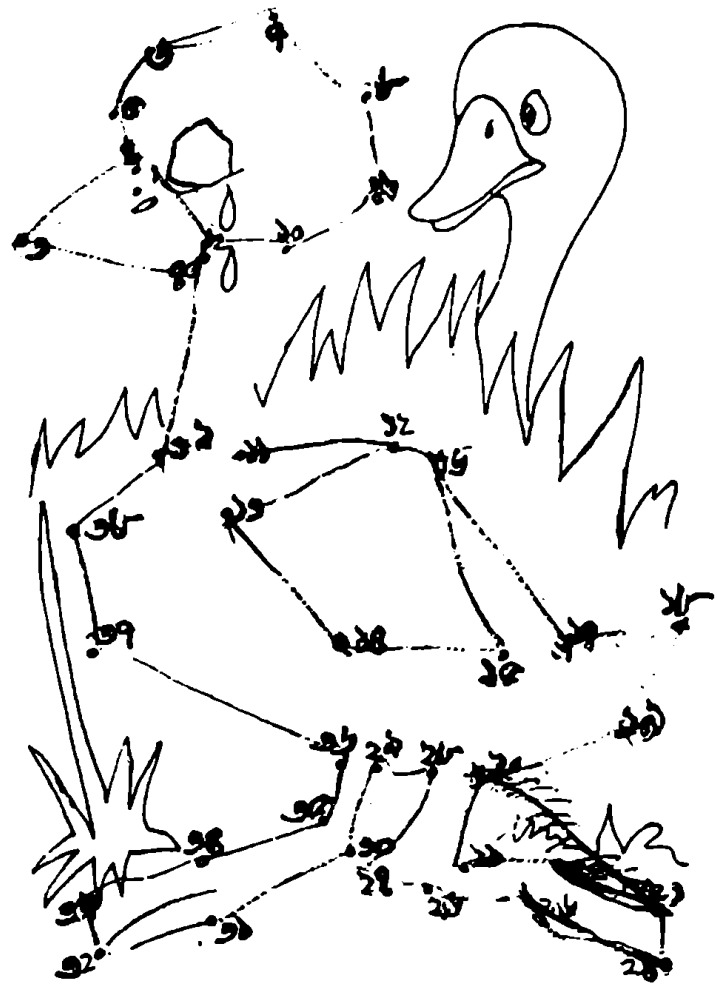

* উপরে দেখ ১ থেকে নম্বর দেওয়া আছে। ঐ বিন্দুগুলি প্রথম থেকে শেষ নম্বর অবধি পর পর রেখা দিয়ে যোগ কর। দেখবে একটি ছবি এঁকে ফেলেছ !

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণদেবের নাম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পূজারী অবস্থায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামে পরে পরিচিত।

তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখার জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকের আগমন হয়েছে। শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর নানান দেশ থেকে মনীষীরা তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

ভারতের সব প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁর জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত রোঁমা রোলা তাঁর সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছেন।

রামকৃষ্ণদেবের নামে অসংখ্য আশ্রম, সেবা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, ভারতের প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠেছে।

একজন তরুণ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর কথা শুনে ভারি খুশি হয়েছিলেন। সেই সন্ন্যাসী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করেন এবং পরে হিমালয় ফিরে যান।

সন্ন্যাসীর কথা রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে শুনলেন।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন, খুব কম বয়সে সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে হিমালয় পাহাড়ের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম এবং সেখানেই থাকতাম। ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়েই সময় কাটাতাম। একদিন এক তীর্থযাত্রীর কাছে শুনলাম ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্যকেও দেখাতে পারেন।

তখন আমার মনে ঈশ্বরকে দেখার আকুল ইচ্ছা নিয়ে হিমালয় থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন ছিল আবার বৃষ্টির দিন। আকাশ ভেঙে পড়েছে। রীতিমত দুর্যোগের দিন।

কোনরকমে রামকৃষ্ণদেবের ঘরে গিয়ে বসলাম। দুর্যোগের দিন বলে হয়তো দর্শনার্থীর ভিড় ছিল না। ঠাকুর চুপ করে বসেছিলেন।

আমাকে দেখে প্রসন্নমুখে পরমহংসদেব বললেন 'কী গো, এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে তুমি আবার কী মনে করে?'

আমার মাথায় হঠাৎ এক চিন্তা এলো; ঠাকুরকে প্রশ্ন করে বসলাম, এই যে বাইরে এমন দুর্যোগ, পথঘাট বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। ঈশ্বর কোথায়

[এর পরের অংশ ১১২ পৃষ্ঠায়]

মহাকাশে বিপদ সংকেত / অমিতাভ সেন

মহাকাশে বিপদ সংকেত / অমিতাভ সেন

[১০৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

থাকবেন? ঈশ্বরের তো বাড়িঘর নেই! তিনি কি তবে বৃষ্টিতে ভিজছেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'তুমি তাহলে ধরে নিয়েছ, ঈশ্বরের বাড়িঘর নেই, তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। কিন্তু তিনি যে সব কিছুরই উর্ধ্বে। বৃষ্টি-ঝড়, আগুন, বাজ কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

তখন প্রশ্ন করলাম, তবে উনি এখন কোথায় আছেন? ঠাকুর বললেন, তিনি কোথায় নেই? তিনি সর্বত্র আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই। তিনি অণরোনীয়ান, মহতো মহীয়ান্।

ধর ছোটর কথা। পিঁপড়ে ছোট, তার চেয়ে আরো ছোট অনেক আছে। রোগজীবাণু তার থেকেও ছোট। এসবের মধ্যে অণুর অণু ছোটর ছোট সেই অণরোনীয়ান ঈশ্বর।

আবার ধর বিশ্বের কথা, মহাকাশের কথা। সেখানে কত বড় বড় তারা রয়েছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে আছে। তা কেউই বলতে পারে না। সেখানেও বড় থেকেও বড়, সেই মহতো মহীয়ান ঈশ্বর। মুনিঋষিরাও এই ঈশ্বরের বর্ণনা দিতে পারেন নি।

তখন আমি করজোড়ে নিবেদন করলাম, 'ঠাকুর ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?'

ঠাকুর বললেন, 'দেখা যায় গো, দেখা যায়। ঈশ্বর নিরাকার, তিনি যে আবার সাকারও।'

ঠিক এই সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নজরে পড়ল। একটা লোক বৃষ্টিতে ভিজে জড়সড় হয়ে বাহিরে বারান্দায় বসে কাঁদছে।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বাহিরে এলেন। হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলেন। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজন শিষ্য এসে গেল।

ঠাকুর বললেন তোমরা কি গো! একটা লোক এমনি ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। আর তোমরা সবাই দিব্যি ঘরে বসে আরামে নিদ্রা যাচ্ছ। পরমহংসদেব নিজের গামছা দিয়ে লোকটির গা মুছিয়ে দিলেন। তারপর তার একজন শিষ্য তাঁকে একটি শুকনো কাপড় দিল। ঠাকুরের নির্দেশে লোকটি ঘরে এসে বসলো। মনে হলো লোকটি অসুস্থ হয়েছে।

ঠাকুর চাদর এনে তার গায়ে দিয়ে দিলেন। তারপর কাছে ডেকে এনে বসালেন। লোকটির পাশে বসে বললেন, তোর খিদে পেয়েছে তাই না রে? মনে হচ্ছে অনেকদিন খাসনি।

ঠাকুর একজন শিষ্যকে বললেন ঐ থলিটা আমায় দে তো। ঠাকুর তার পাশে বসে একটা থালায় খানকয়েক লুচি, পাঁচ ছটা মিষ্টি দিয়ে থালাটা ওর সামনে রেখে বললেন খেয়ে নাও। মনে হচ্ছে তুমি অভুক্ত।

একজন শিষ্যকে ঠাকুর বললেন চুপ করে কি দেখছো? এক গ্লাস জল আনতে পারছো না? ওরে 'জীবই হলো শিব।'

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কোন কথাই হলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চলে এলাম।

একমাস পরে ঠাকুরের ওখানে গেলাম। সেদিন ওখানে খুব ভীড় ছিল। অতো ভীড় দেখে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কিসের জন্য এত ভীড়? কেন এত লোক?

ভীড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখি ঠাকুর পদ্মাসনে বসে—নিশ্চল, নিস্পন্দ।

তাহলে কি কোন দুর্ঘটনা হয়েছে নাকি? ভয়ে ভয়ে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। জানতে পারলাম ঠাকুরের সমাধি হয়েছে। বহুক্ষণ আগেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন।

সাধারণতঃ এত সময় ঠাকুর সমাধিস্থ থাকেন না।

ভক্তেরা তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন একজন ডাক্তার। সাধারণতঃ সমাধির সময় তাঁকে স্পর্শ করা নিষেধ। অধৈর্য হয়ে ভক্তেরা ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে বললেন।

ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন চিকিৎসাশাস্ত্রে এঁকে মৃতই বলা চলে। শরীরে কোন স্পন্দন নেই। ভক্তেরা বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ মায়ের নাম গান করতে লাগলো। দু'একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চোখে জলও দেখলাম। কিন্তু একটু পরেই ঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন। যেন কিছুই হয়নি। বললেন, হ্যাঁরে ভূতোকে খেতে দেওয়া হয়েছে তো? ভূতো অর্থাৎ ভূতনাথ মানে সেই লোকটি, যাকে ঠাকুর বৃষ্টির দিনে খেতে দিয়েছিলেন। যার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন 'দরিদ্রই নারায়ণ।'

তারপর একটা থালায় করে কিছু বাতাসা মিষ্টি কাটা ফল নিয়ে রাস্তার দিকে চলে গেলেন।

আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, ভিখারীদের তিনি বিলি করছেন।

তখন আমার মনে হলো, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা!—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

—এ যে ঠাকুরের কথা। স্বামীজী তাঁর জীবনে জীবসেবাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষা তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছেন। যেমন পরহিতকামী গুরু, তেমনি মহাপ্রয়াণকাল পর্যন্ত পরহিতব্রতী শিষ্য।

অভিনন্দন

ধীরা বক্সী

দিল্লীতে বিশ্বকাপ জয়ী দলের অভিনন্দন : ছবিতে - শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রুডেন্সিয়ালের কাপ হাতে অধিনায়ক কপিল দেব। পাশে উইকেট-রক্ষক কিরি সৈয়দ কিরমানি ও অনেকে। ভোজ সভার আগে তোলা ছবি।

চিনতে পারেন?

রুণা দেব

ছবি দুটি কার? বলতে পারবে! ছবি দেখো!

[৮২ পৃষ্ঠার পর]]

খেলা চলছে তাতে মোহনবাগানই যে ১৯৮৩-র চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা স্পষ্ট।

ফুটবলে আমাদের সামনে একমাত্র যা আকর্ষণ তা হল প্রি-অলিম্পিক খেলায় সৌদি আরবের সঙ্গে

ক্লাইভ লয়েড

আসন্ন খেলাটি। অস্থায়ী কোচ বব বুটল্যাণ্ড এই খেলায় ভারতের সাফল্য সম্পর্কে ভীষণ-ভাবে আশাবাদী। তিনি বলেছেন: আরবকে আমরা হারাবই। সেইভাবেই গোটা দলকে প্রস্তুত করছি। অবশ্য খেলা না হওয়া পর্যন্ত শেষ কথা কে বলতে পারে। তবে আমাদের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ে যেভাবে ভারত একটা গোটা দল হয়ে খেলেছে ফুটবলেও তেমনিভাবে খেলবার প্রেরণা ক্যাম্পের খেলোয়াড়দের মধ্যে জেগেছে।

আগামী শীত মরশুমে ভারত ভ্রমণের জন্য ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলটি নির্বাচিত হয়ে গেছে। যদিও বিশ্বকাপের পর ক্লাইভ হুবার্ট লয়েড, যাকে সবাই আদর করে 'ব্ল্যাক ক্যাট' বলে, তিনি অধি-নায়কত্বের দায়িত্ব ছাড়তে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড তা মেনে নেয় নি। তারা এবারও বহুযুদ্ধের এই নায়কের ওপর আস্থা রেখে তাকেই অধিনায়ক নির্বাচন করেছেন। সহ অধিনায়ক বিশ্বের বন্দিত ব্যাটসম্যান ভিভিয়ান রিচার্ড।

বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে দলটি খেলেছিল তার থেকে বাদ গেছেন ফাউদ আহমেদ বাক্কাস ও দীর্ঘকায় দ্রুতগতির বোলার জোয়েল গারনার। জোয়েল গারনারের বাদ যাওয়ার কারণ শারীরিক অসুস্থতা। দলে নতুন চারজন এসেছেন। তারা হলেন বাতিস্তা অল-রাউণ্ডার, রিচার্ডসন মিডল অর্ডার ব্যাটস-ম্যান; হার্পার অফস্পিনার বোলার ও পইডমনা বদলি উইকেটরক্ষক। আশা করি এবারের প্রতিযোগিতা উত্তেজনা ভরা থাকবে।

পাকিস্তানের আসন্ন ভারত সফরের দল নির্বাচন এখনো হয়নি। তবে চৌকস খেলোয়াড় ইমরান খাঁ যে দলের সঙ্গে আসছেন না এটা স্থির। ইমরান-হীন পাকিস্তান দল যে কত নিষ্প্রভ তা আমরা বিশ্বকাপে দেখেছি। নতুন করে কাকে অধিনায়ক নির্বাচন করা যায় এ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

শোনা যাচ্ছে, জাভেদ মিয়াদাদ বা জাহির আব্বাসের মধ্যে একজন অধিনায়ক হবেন। মিয়াদাদ এর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে অধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর সেবারের অভিজ্ঞতা আদৌ সুখের নয়। জাহির অবশ্য এখনো নেতৃত্ব দেন নি। হয়তো সুযোগ পেলে নতুন কিছু করবেন।

আমেরিকায় ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করার জন্য আটজন খেলোয়াড়ের একটি দল নিয়ে গাভাসকার আমেরিকা গেছেন। ওখানকার একটি সংস্থাই এই সফরের আয়োজন করেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার আগেই এরা সবাই দেশে ফিরে আসবেন। সামনে ভারতের মাঠে দু-দুটো ক্রিকেট সিরিজ। সদ্য বিশ্বকাপ জেতা ভারতীয় দল কেমন খেলবে এটাই এখন সবার কাছে আলোচনার বিষয়। এই আলোচনার চাপে ফুটবল হারিয়ে গেছে বলা যায়। এমন কি আই-এফ-এ শীল্ড নিয়েও যেন কোনো মাথাব্যথা নেই।

বাঙালীর আজও প্রিয় খেলা ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের মক্কা কলকাতাতে ফুটবল মিইয়ে যাচ্ছে এটা ভাবতেও কষ্ট হয়।

বাতিঘরের রাক্ষুসে পাহাড়

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কোন এক দ্বীপের কাছাকাছি এক 'লাইট হাউস' বা বাতি-ঘরকে কেন্দ্র করে। 'লাইট-হাউস' জিনিসটা কি তোমরা হয়তো জান। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অথবা সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ চলাচলের পথে যেখানে ডুবো পাহাড়ের অস্তিত্ব বিপজ্জনক, সেখানে বিপদ এড়াবার জন্যে সরকার অনেক সময় একটা উঁচু গম্বুজাকৃতি বাড়ি বানিয়ে তার ওপর সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে রেখে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে চলাচলকারী জাহাজকে হুঁশিয়ার হওয়ার সুযোগ দেন। সাধারণতঃ এক বা একাধিক কর্মী সেই লাইট হাউস রক্ষণা-বেক্ষণ করেন এবং সন্ধ্যের পর থেকে সারা রাতের জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখেন।

আমরা যে লাইট-হাউসটার কথা বলছি সেটা তৈরী হবার পর থেকেই তাকে ঘিরে এক ভয়ঙ্কর রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

লাইট হাউসটা তৈরী হয়েছিল দ্বীপের মূল ভূভাগ থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ডুবো পাহাড় ভরা জায়গায় যেখানে কালো মোষের মাথার মতো একটা

ছোট পাহাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। এটা তৈরী হবার পর সরকার স্থির করলেন দুজন করে কর্মচারী এক সপ্তাহের যা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী খাবার-দাবার নিয়ে নৌকো করে সেই লাইট-হাউসে উঠবে। এক সপ্তাহ পরে অন্য দুজন তাদের 'রিলিভ' বা ছুটি দিয়ে পরের এক সপ্তাহের জন্য কাজের দায়িত্ব নেবে।

কিন্তু রহস্যের সূত্রপাত শুরু থেকেই।

প্রথম যে দুজন ব্যক্তি তাদের জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে লাইট-হাউসে উঠেছিল সপ্তাহ শেষে পরের দুজন গিয়ে তাদের আর খুঁজে পেল না।

তারা নেই। স্রেফ উবে গেছে।

হ্যাঁ, উবেই গেছে বলতে হবে কারণ পরের দুজন এক সকালে গিয়ে প্রথম দুজন কর্মচারীর যা কিছু জিনিসপত্তর, মায় পায়ের জুতো জোড়া পর্যন্ত খুঁজে পেল কিন্তু মানুষ দুজনকে কোথাও দেখতে পেল না। এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই তাদের।

দ্বিতীয়বারের কর্মচারীরা অবাক হোল। মূল ভূখণ্ডে এসে সরকারী কর্তৃপক্ষকে খবর দিল। সরকারী অনুসন্ধান হোল কিন্তু প্রথম কর্মচারী দুজনের টিকিও কোথাও দেখা গেল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হোল নিশ্চয়ই কোন কারণে তারা লাইট-হাউস ছেড়ে কিংবা মদ-টদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেছে।

কিন্তু দুজন একই সঙ্গে এসব কাজ করলো! ঠিক যেন বিশ্বাস যোগ্য নয়।

তবু ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়তে দেরী হোল না। দ্বিতীয় দুজনকে ঠিক একই ভাবে একদিন পাঠান হোল এক সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর দিয়ে ওই লাইট-হাউসএর উদ্দেশ্যে।

এক সপ্তাহ বাদে তাদের রিলিভ বা ছুটি দিতে তৃতীয় দুজন গিয়েও দেখে একই ব্যাপার।

এক সপ্তাহ আগে যারা এই লাইট হাইসে ডিউটি দিতে এসেছে তারা রাতারাতি নিরুদ্দেশ।

তারা যা কিছু এনেছিল তা তো পড়ে আছেই এমনাক 'লাইট-হাউস'এর আলোটা পর্যন্ত পরদিন ভোরে আর নেভান হয় নি। অর্থাৎ যেদিন এসেছে তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বেপাত্তা হয়েছে দ্বিতীয় কর্মচারী দুজন।

একি অদ্ভুত রহস্য!

এবার রীতি মত হুলুস্থুল পড়ে গেল। দিনের বেলা সরকারী লোকেরা গিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাল 'লাইট-হাউস আর তার চার পাশে। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। তাহলে জলজ্যান্ত চার-চারজন মানুষ গেল কোথায়? কেউ কি এসে গুম্ করে নিয়ে গেছে? কিন্তু তাতে লাভ কি? মানুষ গুলোর যাবতীয় জিনিপত্তর, টাকাপয়সা, মায় জুতোজোড়া পর্যন্ত সাজান রয়েছে যথাস্থানে। এর অর্থ আচমকা নিরুদ্দেশ হয়েছে চারটে মানুষ।

পুলিস আর অনুসন্ধানকারীর দল পরপর ক'দিন অনুসন্ধান চালিয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কোথাও কোনো সূত্র নেই। অথচ ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর কোনো উপায় না দেখে সরকার ওই ভূতুড়ে 'লাইট-হাউস' বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ এভাবে দিনের পর দিন মৃত্যুপুরীতে লোক পাঠিয়ে মেরে ফেলা তো যায় না।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার আগেই বাধা পড়লো। দুজন তরুণ এসে দেখা করলো সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। একজনের নাম হ্যারিস, অন্যজন পিটার।

দুই ভাই। দুজনেই বেশ সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান এবং শক্ত সামর্থ চেহারা। ওরা জানাল দ্বিতীয় দলে যাত্রা করে লাইট-হাউস মিস্ট্রিতে যে অ্যালান নামে কর্মচারীটি নিরুদ্দেশ হয়েছে সে ওদেরই বড় ভাই।

ওরা সরকারী সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার আগে একবার সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চায়।

কোন ভাবেই তাদের বোঝান গেল না। হ্যারিস আর পিটার নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। ওরা বার বার শুধু একটা কথাই বলতে লাগলো—জগতে কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় না। এ রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা কোন দিক আছে যা অনুসন্ধানের হৈ চৈ-এর মধ্যে ধরা পড়ছে না। ওরা তাই শেষবার একটা গোপন অনুসন্ধান চালাতে চায়। আর একাজ যদি তারা না করে তবে তাদের প্রিয় বড় ভাই অ্যালান-এর প্রতি নাকি তাদের কর্তব্য পালন হবে না।

এরপর আর কি বলার থাকে? সরকারী কর্তৃপক্ষকে রাজী হতেই হোল।

২

দিন দুয়েকের মধ্যেই হ্যারিস আর পিটার একটা মোটর-বোট ভাড়া করে যাত্রা করলো রহস্যময় লাইট-হাউসটার দিকে। ওরা দুজন ছাড়া বোটে ছিল মাত্র এর চালক। ওদের ইচ্ছে মতো পুলিসীলঞ্চ অনেক পেছনে ঘাপটি মেরে রইলো। সমস্ত অভিযানটাই গোপনে এবং নিঃশব্দে হোক—এটাই উদ্দেশ্য।

লাইট-হাউসটার পেছনে ৫০ গজ মতো দূরত্বে মোটর বোটটা এসে থামলো। ঝলমলে প্রকৃতি, নীল আকাশ, সুনীল সমুদ্র। হ্যারিস আর পিটার দুজনেরই কাছে রয়েছে সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। কোমরে কোল্ট-৩৫ বুলেটের ভারী রিভলবার।

বাইনোকুলার অনেকক্ষণ চোখে লাগিয়েও লাইট-হাউসটার ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। নানা ভাবে নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ চালাল ওরা। সমুদ্রের মাঝে মোষের মাথার মতো জেগে থাকা পাহাড়টার ওপর লাইট হাউসটা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল হ্যারিস। দুই ভাইয়ের মধ্যে সেই বছর খানেকের বড়। হ্যারিস পিটারকে বললো, শোন আমি এখন চুপি চুপি একটা নৌকা নামিয়ে পেছন দিক থেকে ওই লাইটহাউসে ঢুকবো। তুই মোটর বোট নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। যদি আমার গুলির শব্দ বা অন্য কোন সংকেত পাস আর অপেক্ষা না করে পেছনের পুলিসী লঞ্চকে খবর পাঠিয়ে নিজে এগিয়ে যাবি। বুঝেছিস?

দুই ভাইই ডাকাবুকো। তাই হ্যারিস-এর প্রস্তাবে পিটার মোটেই ভয় পেলো না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

হ্যারিস একটা ছোট নৌকা নামিয়ে একাই লাইট-হাউসটার দিকে এগিয়ে চললো।

তখন কি ও এ যাত্রার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাটা ভেবেছিল?

৩

লাইট-হাউসের ভেতর বাইরেটা অনেক ঘুরেছে হ্যারিস কিন্তু এখনও কোন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি।

লাইট-হাউসের নীচে পাহাড়টার ওপর ও এসে দাঁড়ায়। বিকেলের রোদ পড়ে আসছে। সঙ্গে

সঙ্গে পায়ের তলার পাথরও ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এখানকার পাহাড়ের গা মসৃণ। কারণটা নিশ্চয়ই সমুদ্রে যখন ঢেউ ওঠে জল এসে ধুইয়ে দিয়ে যায় পাহাড়ের গা। কিন্তু মসৃণ হলেও বেশ কিছু খাঁজ এবং গর্ত চোখে পড়ছে। কাঁকড়া জাতীয় সামুদ্রিক জীব ওসব জায়গায় বাসা বেঁধে থাকা বিচিত্র নয়। দেখতে দেখতে চোখে পড়লো পায়ের কাছে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে লম্বামতো কি একটা মাথা তুলেই সট্ করে আবার লুকিয়ে পড়লো। কাঁকড়া তো নয়। অন্য কোন জাতের সামুদ্রিক জীব নিশ্চয়ই।

হ্যারিস এবার উঠে এল লাইট হাউসটার ওপরে বিদ্যুৎ ঘরটার ভেতরে। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসেছে, সুতরাং দোর খুলতে অসুবিধে হোল না। ইতিমধ্যে দিনের আলো কমতে শুরু করছে। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। কি মনে হতে লাইট-হাউসের আলোর সুইচগুলো 'অন্' করে দিল হ্যারিস। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাইরের সামুদ্রিক প্রকৃতি।

এবার কি করবে হ্যারিস? আর কি দেখার আছে? যা কিছু দেখার সবই তো হোল কিন্তু বোঝা তো কিছু গেল না। সব কিছুই স্বাভাবিক। তবে কি ওরা এখান থেকে নিরুদ্দেশ হোল...

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কি দেখে থমকে গেল হ্যারিস। ঘরের কোণে ওখানে ওগুলো কি পড়ে রয়েছে?

দৌড়ে সেখানে গিয়ে ওগুলো হাতে তুলে নিল। এক গোছা বাদামী চুল। মানুষেরই মাথার চুল, নিশ্চয়ই অনুসন্ধানী দলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বাদামী চুলের গোছাটা হাতে নিয়ে হ্যারিসের দাদা অ্যালানের কথাই মনে পড়লো। দাদার মাথার চুলও ছিল এমনি রুক্ষ আর বাদামী।

কিন্তু চুলের গোছা এখানে এল কি ভাবে?

তবে কি যারা কোন অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আসলে নিরুদ্দেশ হয়নি—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন পরিণতি ঘটেছে তাদের জীবনে?

মাথার চুল ছাড়া যে মানুষের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—কোন্ পরিণতি ঘটতে পারে তার ভাগ্যে? ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।

হঠাৎ খোলা দরজা পথে চোখ পড়তেই হ্যারিস প্রথমটা বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর এক হিমশীতল আতঙ্কের স্রোত বইতে শুরু করলো ওর মেরুদণ্ড দিয়ে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে কোমর থেকে রিভলবার বার করে ট্রিগার টিপলো—গুড়ুম.... ...গুড়ুম.... !

৪

গুড়ুম! গুড়ুম!

গুলির আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলো পিটার। এতো শুধু সংকেত নয়। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে হ্যারিস। মোটর-বোট নিয়ে ও দ্রুত ছুটে চললো লাইট হাউস এর দিকে। সেই সঙ্গে 'বক্স ওয়ারলেসে' দূরে অপেক্ষমাণ পুলিস লঞ্চকে খবর পাঠাতেও ভুললো না।

লাইট-হাউসএর চত্বরে পা দিয়েই আর একবার চমকে উঠলো পিটার।

ওগুলো কি? বাতিঘরের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল হাজারে হাজারে জীব কালো পাহাড়ের গর্ত আর খাঁজগুলো থেকে বেরিয়ে লাইট-হাউসের ভেতর যেন মিছিল করে ঢুকে যাচ্ছে।

লম্বায় এক হাতের বেশী নয়। বুকে হেঁটে চলে।

সাপ জাতের এক ধরনের আশ্চর্য সামুদ্রিক সরীসৃপ। কিন্তু ওরা এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে লাইট-হাউসের ভেতরে ঢুকছে কেন? এত সাপ একসঙ্গে কোনদিন দেখে নি পিটার!

আবার গুলির শব্দ। লাইট-হাউসের উপরে যেন পাগলের মতো গুলি ছুঁড়ে চলেছে হ্যারিস।

এতক্ষণে সমস্ত চিত্রটা পিটারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

হাউসটায়।

বিদ্যুৎ ঘরটায় ঢুকেই থমকে দাঁড়াল পিটার। একি বীভৎস দৃশ্য! হ্যারিসের রিভলবারের গুলি শেষ। হিংস্র সরীসৃপগুলো ক্রমেই আরও বেশীকরে ছেঁকে ধরেছে। মাংস খুবলে খাচ্ছে ওর শরীর থেকে, রক্তে মাখামাখি ওর শরীরটা। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে মেঝেতে। এতক্ষণ পাগলের মতো ওই হাজার হাজার হিংস্র সরীসৃপ গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে

ওই হিংস্র সরীসৃপ গুলো ওপরে উঠে নিশ্চয়ই ছেঁকে ধরেছে হ্যারিসকে। কিন্তু ওদের ভেতর দিয়ে কি করে ভেতরে ঢুকবে পিটার। সে যে অসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু অসাধ্য সাধন করতেই হবে। যে ভাবে দাদা অ্যালানকে হারিয়েছে আর এক ভাই হ্যারিসকেও একই ভাবে চোখের ওপর মরতে দিতে পারে না সে।

ভারী বুটের তলায় সরীসৃপ গুলোকে মাড়িয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র পায়ে লাইট-হাউসের ওপরে চললো। ইতি মধ্যেই সরীসৃপগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত লাইট-

হ্যারিস এখন বুঝি অবসন্ন। ওরা এখন ক্রমেই কোমর ছাড়িয়ে উঠছে পেট বুক, তারপর আরও ওপরে। চোখ দুটো হ্যারিসের ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে মুখমণ্ডলে। ও টলতে শুরু করেছে—যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে সরীসৃপ ভরা ঘরটার মেঝেতে।

তার আগেই পিটার লাফিয়ে গিয়ে হ্যারিসকে ধরে ফেললো। রাক্ষুসে সাপ জাতীয় সরীসৃপের দল এখন ওকেও ছেঁকে ধরতে শুরু করেছে। পিটার আর অপেক্ষা করলো না। কোনরকমে ওদের মধ্যে থেকে হ্যারিসকে টেনে চিঁড়ে বারকরে আনলো

তারপর পাঁজাকোলা করে ধরে নেমে এল নীচে। কয়েকটা সরীসৃপ তখনও মাংস কামড়ে ঝুলে রয়েছে ওদের শরীরে। অত্যন্ত দ্রুত সেগুলো টেনে টেনে ফেলতে লাগলো পিটার।

মোটর বোটের ওপর যখন হ্যারিসের শরীরটা তুলে আনলো সে হ্যারিস জ্ঞানহীন। পিটারের শরীরের মাংসও খুবলেছে ওই রাক্ষস গুলো। তার শরীর থেকেও রক্ত ঝড়ছে।

ইতিমধ্যে পুলিস-লঞ্চ এসে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিস নেমে পড়েছে বাতি-ঘরের ওই রাক্ষুসে পাহাড়টায়।

৫

হ্যারিসকে অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বাঁচান যায় নি। ওই রাক্ষুসে সরীসৃপগুলো তার শরীরের জায়গায় জায়গার মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত খুবলে খেয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে ও হার মানলো।

হ্যারিস মারা গেলেও এই দুই ভাইই শেষ পর্যন্ত লাইট-হাউস মিস্ট্রির সমাধান করে গেল। আসলে সাপ জাতীয় ওই হিংস্র সরীসৃপ গুলো সমুদ্রের মধ্যে ওই পাহাড়ের খাঁজ আর গর্তে বংশ বিস্তার করে বাস করতো বহুকাল যাবৎ। ওরা প্রচণ্ড হিংস্র এবং মাংসাশী। প্রধানতঃ সামুদ্রিক মাছ আর প্রাণীদের উদরস্থ করেই এতদিন বেঁচে ছিল ওরা। কিন্তু লাইট-হাউসটা তৈরী হবার পর নতুন তাজা খাবারের সন্ধান পেল। সারাদিন যখন সূর্যের তাপ বেশী থাকতো ওরা পাহাড়ের ফাটলে লুকিয়ে থাকতো। তারপর সন্ধ্যের পর যখন সূর্যের তাপ কমতো ওরা হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়তো খাদ্যের সন্ধানে। এইভাবে 'লাইট-হাউস' তৈরী হবার পর সরকারী কর্মচারীরা যখন আসতো প্রথম রাত্রেই তারা এদের কবলে পড়তো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই রাক্ষুসে সরীসৃপ গুলো এসে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেঁকেধরে তাদের খুবলে খেয়ে নিঃশেষ করে দিত। একটুকরো হাড় বা শরীরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ফেলে রেখে যেত না। এই ভাবেই নিরুদ্দেশ হয়ে ছিল চার-চারজন হতভাগ্য মানুষ। সরকার অবশ্য এরপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই পাহাড়ী সরীসৃপ কুল ধ্বংসকরার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। তারা ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে লাইট-হাউস মিস্ট্রিরও অবসান হোল।

এরপর সেই বাতি ঘরে প্রথম আলো জ্বালাবার দায়িত্ব যাকে দেয়া হোল—সে পিটার!

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। পিটার আজ বৃদ্ধ। কিন্তু আজও কোন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় নাবিকেরা জাহাজ নিয়ে লাইট-হাউসটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পায় লাইট-হাউসের আলোকিত গম্বুজটার নীচে সাদাচুলওয়ালা এক বৃদ্ধ সাগরের জলে উদাসী দৃষ্টি মেলে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাবিকেরা তখন চুপিচুপি বলাবলি করে—ওই সেই পিটার, একান্ত প্রিয় ভাইএর জীবনের বিনিময়েও অনেকগুলো মানুষকে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে যে বাঁচিয়েছে।

বাতিঘরের আলো আজও জ্বালিয়ে রেখেছে পিটার!

—০—

বিভীষিকার নায়ক !

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

সাড়ে তিন যুগের ওপর হতে চললো দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তোমরা অর্থাৎ ছোটরা সেই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের কিছুই জান না। বই পড়ে, সিনেমায় ছবি দেখে কিংবা বড়দের মুখে শুনে মনে মনে একটা আন্দাজ করে নিয়েছো। প্রায় সারা পৃথিবী ব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। আমাদের

এই ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি। কারণ ভারতবর্ষ তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল। ঐ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও তার বিষময় ক্ষত এখনও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কত মানুষ ঐ মর্মান্তিক বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল তার সঠিক হিসাব আজও পাওয়া যায়নি। মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি সম্পত্তির ক্ষতির হিসাব।

স্বভাবতই তোমাদের ফুলের মতো সুন্দর ও নিষ্পাপ মনে প্রশ্ন জাগবে কে ঐ মহাযুদ্ধের মূল নায়ক ছিলেন? কে ঐ রক্তপিপাসু নায়ক, যার অঙ্গুলি হেলনে শান্তির পৃথিবীতে এসেছিল রক্তের বন্যা? মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। কুরুক্ষেতের যুদ্ধে গান্ধারী তাঁর নিহত শত পুত্রের শোকে যে বুক ফাটা কান্না কেঁদেছিলেন গত বিশ্বযুদ্ধের শেষে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ গান্ধারী ঠিক ঐ ভাবেই কেঁদেছিলেন।

এই বিভীষিকার নায়ক ছিলেন হিটলার। জার্মানীর সর্বময় কর্তা হের অ্যাডলফ হিটলার। হিটলারের লালসায় পৃথিবীর আকাশ বাতাস এবং মাটি বারুদের গন্ধে ভরে উঠেছিস। সবুজ শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ফল ও ফুলের বাগান নিশ্চিহ্ন করে তার উপর দিয়ে ছোটাছুটি করেছিল ফৌজী ট্যাঙ্ক। প্রাচীন মিউজিয়ামগুলি পরিণত হয়েছিল ফৌজী-সদর দপ্তরে। শিশুদের বাগান হয়েছিল কবরস্থান।

আজকের দ্বিখণ্ডিত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী তখন এক ছিল। ঐ সর্বনাশা ভয়ংকর যুদ্ধে জার্মানী শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আমেরিকা, ইংরেজ ও রাশিয়া প্রভৃতি মিলে মিত্রবাহিনী গঠিত হয়। তোমরা বড় হয়ে পৃথিবীর ইতিহাস পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবে।

কিন্তু এত বড় যে নায়ক—যাঁর নামে পৃথিবী কাঁপতো —তিনি কি নিরাপদ ছিলেন? তিনি কি স্বেচ্ছায় যেখানে সেখানে নির্ভয়ে সাধারণ মানুষের মতো ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারতেন? না। তাঁকে সব সময়ে কড়া পাহারায় থাকতে হোত। বড় বড় ফৌজী ও সরকারী গোয়েন্দা তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ভারী আর্মডগার্ড না নিয়ে কোথাও তাঁর যাওয়া সম্ভব হোত না। অর্থাৎ এত বড় মানুষেরও শত্রু ছিল। হিটলারের প্রাণনাশে সর্বদাই শত্রুরা তৎপর থাকতো ভাবলে খুবই আশ্চর্য লাগে, না? বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েও হিটলার যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আমার এ কাহিনী হিটলার কতবার যমরাজের প্রাসাদ দুয়ার হতে ফিরে এসেছিলেন!

(১) তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হয় নি। বার্লিন স্টেডিয়ামে কি একটা ট্রফির ফাইনাল খেলা হবে। ফাইনালে উঠেছে জার্মান দল আর ইওরোপের অন্য একটি দেশের দল। ঘোষণা করা হোল স্বয়ং হিটলার মাঠে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার বিতরণ করবেন। জোরদার পাহারা বসানো হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। হিটলার এলেন। খেলা শুরু হোল। হঠাৎ কি মনে হোল হিটলারের। জরুরী একটা ফাইলে সই করা দরকার। পুরস্কার বিতরণের ভার অন্যের ওপর দিয়ে হিটলার ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। হিটলার চলে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট পর প্রচণ্ড শব্দ করে মঞ্চটি ভেঙ্গে গিয়ে আগুন ধরে গেল। মঞ্চে বসেছিলেন সাতজন মানুষ। পাঁজজন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারালেন। বাকী দু'জন হাসপাতালে পরের দিন মারা গেলেন। এইভাবে হিটলারের প্রথম প্রাণ রক্ষা হয়!

(২) প্রথম দিকে হিটলারের কয়েক জন বান্ধবী

ছিলেন। সন্ধ্যের পর 'ডেট' অনুযায়ী এক একজন বান্ধবী আসতেন হিটলারের নিঃসঙ্গ জীবনে গল্প করতে, তাঁর অবসর বিনোদ করতে। যদিও এইসব বান্ধবীদের হিটলারের কক্ষে প্রবেশের আগে দেহতল্লাসী দিতে হোত নারী গোয়েন্দাদের কাছে। বলা তো কিছুই যায় না। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। একদিন এক বান্ধবী তল্লাসীর পর হিটলারের কক্ষে এলেন অত্যন্ত সুসজ্জিতা হয়ে। এক মিনিট কথা বলে হিটলার বিশেষ কাজে ফৌজী সদর কার্যালয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন অপেক্ষা করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন। এলেন দু'ঘণ্টা পর। এসে দেখলেন টাইম বোম বিস্ফোরণে বান্ধবী মরে পড়ে আছে। মিলিটারী গার্ড দিচ্ছে। চুলের মধ্যে বোমাটা ছিল।

(৩) হিটলার হত্যার তৃতীয় ষড়যন্ত্রটি অভিনব ব্যাপার হয়েছিল।

হিটলারের কুকুরের দারুণ সখ ছিল। ভীষণ ভালবাসতেন কুকুরদের। হিটলারের অনেকগুলি নিজস্ব কুকুর ছিল তার মধ্যে বিশেষ একটি কুকুরকে সব সময়ে কাছে রাখতেন। এমনকি ডাইনিং ও লাঞ্চ টেবিলেও সেই কুকুরটিকে দেখা যেত। হিটলারের অনেক জেনারেল বা সেনাপতি এই জিনিসটা ঠিক পছন্দ করতেন না। অথচ হিটলারের ভয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না তাঁরা। এইসব কুকুরদের বিশেষ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ফৌজী বিভাগের কয়েকজনের ওপর দায়িত্ব ছিল।

একদিন হিটলার ডাইনিং টেবিলে বসে আহার করতে উদ্যত হয়েছেন। পাশে যথারীতি কুকুরও আছে। হঠাৎ খাস চেম্বারে জরুরী টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ডাইনিং রুমের পাশেই খাস চেম্বার। হিটলার তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন, জরুরী ফোনটা ধরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এত জোর শব্দ যে পাশের ঘরে হিটলার চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। সৈন্যরা ছুটে এলো শব্দ শুনে। ডাইনিং রুম ভস্মীভূত এবং প্রিয় কুকুরটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাজ্জব ব্যাপার। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল কুকুরের গলার বকলসে যে ঘুমুর ছিল তার মধ্যে একটা শক্তিশালী টাইম-বোমা ছিল। জোর অনুসন্ধান চলতে লাগলো অপরাধীকে ধরার। হিটলারের সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্ট বুঝতে পারলেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়েছে। সুতরাং আরও জোরদার পাহারার ব্যবস্থা হোল। সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন অফিসারের রদবদল হোল। এই সময়ে জার্মান সেনা দুর্বার গতিতে ইওরোপের অধিকাংশ রাজ্য দখল

করে ফেলেছে।

(৪) হঠাৎ একদিন বার্লিনের সদর রাস্তায় দেখা গেল জার্মান সৈন্যতে ছেয়ে গেছে। কি ব্যাপার? জানা গেল জরুরী কাজে স্বয়ং হের হিটলার মোটর যোগে এই পথ দিয়ে যাবেন। তাই কড়া নজর রাখা হচ্ছে। হিটলার ইদানিং আর প্রকাশ্যে কোথাও বার হতেন না। তাই হিটলারকে দর্শন করার জন্য উৎসুক জনতার ভিড় বাড়তে লাগলো। দূর থেকে সাইরেন বেজে উঠলো। সৈন্যরা আরও সতর্ক হয়ে গেল। পরপর চারটে মোটর এবং সামনে পেছনে মিলিটারী ভ্যান। রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার! হঠাৎ দুম দুম করে হিটলারের বিশেষ গাড়িতে কোথা থেকে বোমা পড়লো। যেন আকাশ থেকে বোমা পড়লো। এক সেকেণ্ডে ভয়ে জনতার ভিড় পরিষ্কার হয়ে গেল। দুর্ঘটনায় কবলিত হিটলারের অগ্নিদগ্ধ গাড়িটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। মিলিটারীর দল সব চলে গেল অন্য গাড়িগুলিকে নিয়ে। সবাই জেনে নিলো স্বয়ং হের হিটলারের এবার সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘটেছে। এ থেকে বাঁচার কোন আশা নেই। যে অঞ্চলে হিটলারের গাড়িতে বোমা পড়ে এই মর্মান্তিক কাণ্ডটি ঘটে সেই অঞ্চলটি ছিল ইহুদিদের বসতি। কিছুক্ষণ পরেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো জার্মান সৈন্যরা ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবশ্য যুদ্ধের শুরুতেই হিটলার সন্দেহবশত বহু ইহুদি নারী পুরুষকে গ্রেপ্তার করে রেখেছিলেন। জার্মান সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার করলো ইহুদিদের ওপর—শিশুরা বাদ গেল না। পরের দিন বিদেশের সব সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে হিটলারের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হোল। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যুদ্ধের অবসান হবে ভেবে। কিন্তু হায় ভগবান! হিটলার যে জার্মানীর প্রহ্লাদ! প্রচার করা হোল হের হিটলার সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্ট জানতে পেরেছিলেন ঐ পথে হিটলারের মৃত্যু ঘটতে পারে। অথচ হিটলারকে জরুরী কাজে যেতেই হবে। হিটলারকে অন্য ঘুর পথে পাঠিয়ে দিয়ে এমন ভাব দেখানো হল যে তিনি ঐ পথ দিয়ে যাবেন। সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্টের সন্দেহটা সঠিক কিনা তাও প্রমাণিত হবে। হিটলারের একটা মোটরে হিটলারের একটা ডামি তৈরি করিয়ে বসিয়ে রাখা হয়! যুদ্ধের শেষে অনেকে বলেছেন ইহুদি নিধন করতে ওটা ছিল তাঁর একটা কৌশল! কেননা বিনা দোষে তো শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষ করে জার্মান যখন নিজেদের সভ্য আর্যজাতি অহঙ্কার করে! গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান কর্তৃক নিরীহ ইহুদি অত্যাচারের বহু মর্মান্তিক কাহিনী বড় হয়ে তোমরা জানতে পারবে। সে সব কথা এখন থাক। ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে।

(৫) জার্মান সেনানায়কদের একাংশ গোপন বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে পড়েন দেশের রাজনৈতিক বিরোধী নেতাদের সঙ্গে। তাঁরা মনে করলেন যে হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেই। সুতরাং দেশের স্বার্থে হিটলারকে হত্যা করা পবিত্র কাজ। স্থির হোল হিটলারের আলোচনা কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করতে হবে। কিছু বোমা কাছাকাছি কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হোল। দুর্ভাগ্যবশত ব্যবহারের পূর্বেই হঠাৎ একটি বোমা আপনা থেকে ফেটে যাওয়ায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ঘটনা না ঘটলে হিটলারের মৃত্যু কেউই ঠেকাতে পারতো না।

(৬) স্বয়ং হিটলার আদেশ করলেন তাঁর সৈন্যদের

ব্যবহারের জন্য নতুন ধরনের কোট প্রস্তুত করতে। কোট তৈরী হোলে এবং হিটলারকে তা দেখাবার ভার পড়লো ভন বুশকে'র ওপর। ভন বুশকে সুযোগ পেয়ে কোটের এক গোপন পকেটে একটি বোমা লুকিয়ে রাখলেন। হঠাৎ যুদ্ধ সংক্রান্ত জরুরী ব্যাপারে হিটলার বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে আর কোট দেখা সম্ভব হয় নি।

(৭) ফ্রান্সে জার্মান সৈন্য তুমুল লড়াই করছে প্যারিস অধিকারের জন্য। এ সময়ে মিত্রবাহিনীর দুটি সাংঘাতিক প্লাস্টিক বোমা জার্মান সেনানায়কদের হাতে আসে। ভন স্টফেনবার্গ হিটলারের প্রাণ নাশের জন্য একটি বোমা লুকিয়ে রাখেন সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা করবার জন্য। একদিন ভন স্টফেনবার্গ গোপন সূত্রে জানতে পারলেন এক বিশেষ বিমানে স্বয়ং হিটলার প্যারিসে আসবেন। নির্দিষ্ট সময়ে এক মদের পেটিতে বোমাটি লুকিয়ে রাখা হয় বিমানের মধ্যে। হিটলার প্লেনে চড়তে আসছেন এমন সময়ে আকাশে দেখা গেল মিত্রবাহিনীর বিমান। হিটলারের যাওয়া আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বোমা'টি ফেটে প্লেনটি ধ্বংস করে দিল!

(৮) ২০শে জুলাই ১৯৪৪ সাল। ডান চোখে কালো পট্টি, ক্ষত বিক্ষত মুখ। বাঁ হাতটি নেই! এই চেহারার একজন মানুষ রাস্টেনবুর্গে এসে পৌঁছলেন। ডান হাতে একটি ব্রীফকেস। সঙ্গে এক সুপুরুষ যুবক। তাঁরও হাতে একটি ব্রীফকেস। চোখে পট্টি লাগানো ক্ষত-বিক্ষত মানুষটি একজন জার্মান সেনানায়ক। উভয়েরই মুখে দাড়ি ও চোখে কালো গগল্‌স। তাঁরা এক জীপে উঠে বসলেন। চেকপোস্টের প্রথম বাধা এড়িয়ে জীপটি অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করলো। দু'জনেই নির্বাক। আর একটি চেকপোস্ট এলো। অরণ্যের গভীরে এক সুরক্ষিত স্থানে হিটলারের দপ্তর। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া এবং স্থানে স্থানে মাইন পোঁতা। গাড়ি থেকে নেমে এবার হাঁটার পালা। প্রবেশ দ্বারেই জেনারেল ফেলগিবেল, চীফ অব সিগন্যালস! কি কথা হোল। জেনারেল ফেলগিবেলের গোঁফের নিচে মৃদু হাসি খেলে গেল। ক্ষত বিক্ষত মুখের সঙ্গীটি আবার জীপে গিয়ে বসলো। ক্ষতবিক্ষত মুখের মানুষটি ভেতরে প্রবেশ করে যে কক্ষে হিটলার আলোচনায় বসেন সেই টেবিলের নিচে হিটলারের চেয়ারের কাছে তাঁর ব্রীফকেসটি রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে জীপে বসলেন। প্রথমে ঠিক ছিল মাটির নিচে এক কংক্রীটের ঘরে হিটলার আলোচনায় বসবেন। মুসোলিনীরও আসার কথা। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল দারুণ গরমের জন্য হিটলার মাটির তলার ঘরে না বসে ওপরের ঘরে বসবেন। হঠাৎ ক্ষতবিক্ষত মুখের জেনারেলের খেয়াল হোল বোমার মধ্যে অ্যাসিডের পাত্রের সঙ্গে ফিউজ তার লাগানো হয়নি। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে ফেলে আসা টুপিটা আনতে ভেতরে গেলেন। কাজ সেরে চলে এলেন। ঠিক পাঁচমিনিট পর মিটিং শুরু হবে। এবার হিটলারের নির্ঘাত মৃত্যু। মিটিং শুরু হতেই এক জেনারেলের পায়ে ঐ ব্রীফকেসটি লাগতে তিনি সেটিকে বিরাট ঘরের এক কোণে রেখে এলেন। যেখানে অন্য সব ব্রীফকেস আছে। বোমা ফাটলো। অরণ্য কেঁপে উঠলো। ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। বাইরের সবাই মনে করলো ঘরের সবাই মরে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন জেনারেলের কাঁধে ভর দিয়ে হিটলার ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

[শেষাংশ ১৩৩ পৃষ্ঠায়]

গোয়েন্দা

সৌরেন দত্ত

চাইবাসার গভীর জঙ্গল। সেখানে সাঁওতালরা হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে কেমন আপস করে নির্ভাবনায় বসবাস করছে, চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস হতো না। পূজোর ছুটিটা সেখানে কাটাতে গিয়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা মন্দ নয়, ভাবলো অর্ণব সেন। অথচ ওদের এক মাত্র অস্ত্র হলো তীর ধনুক। তাদের ধনুকের ছিলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া এক একটা তীর অরণ্যের হিংস্র পশুদের কাছে বন্দুকের গুলির মতোই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ যেন। তীর-ধনুক হাতে সাঁওতালদের দেখলেই তারা ভয়ে ছুট দেয় অরণ্যের গভীরে।

ফরেস্ট বাংলোয় বসে বসে সেই সব মজার দৃশ্যগুলো দেখে উপভোগ করে অর্ণব, সেই সঙ্গে আশ্চর্যও কম হয় না। আজ তিনদিন হলো সে এখানে এসেছে বন্ধু অত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। ফরেস্ট বাংলোর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রাকেশ সিনহা তাদের দুজনেরই বন্ধু। তার আহ্বানেই তাদের এখানে আসা। চিঠিতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সে লিখেছিল, "দোস্ত, কোলকাতায় খুন-খারাপি, রাহাজানি নিয়ে তো অনেক সময় কাটাও, না হয় দু'দিন এখানে এসে মানুষ আর জানোয়ারদের সহ-অবস্থান দৃশ্য কেমন দেখেই যাও না নিজের চোখে।"

চাইবাসায় আসার সময় অত্রী তাকে পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছিল, "ওখানে গিয়ে যেন কোন খুনের কিংবা চুরির কেসে জড়িয়ে পড়ো না বন্ধু!"

"আরে না, না, তুমি যা ভাবছো তা নয়। ওখানে ঐ জঙ্গলের দেশে ওসবের কোন ঝামেলা নেই। জানোয়ারদের বিরুদ্ধে মানুষের কি আর অভিযোগ থাকতে পারে বলো?"

"কিছুই বলা যায় না অর্ণব। জঙ্গলের দেশে জানোয়ারদের বিরুদ্ধে হয়তো মানুষের কোন অভিযোগ না থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে তো থাকতে পারে?" অত্রী যুক্তির জাল বুনে বলেছিল, "আর তুমি তো ভালো করেই জানো জানোয়ারের থেকেও মানুষ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হিংস্র!"

তার কথাটা অর্ণব ফেলতে পারেনি, মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল মৃদু হেসে, "তোমার দূরদৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ অত্রী।"

অত্রীর আশঙ্কা যে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো দুদিন সেখানে যেতে না যেতেই। দু'চার দিনের জন্য তাদের চাইবাসায় বেড়াতে যাওয়া। তাই বলতে গেলে কোলকাতার পরিচিত কাউকেই এখানকার ঠিকানা তারা দিয়ে আসেনি। তা সত্ত্বেও অর্ণবের নামে ডাকে একটা চিঠি আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলো না অত্রী। কোন রকমে বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে অর্ণবের দিকে

চিঠিটা এগিয়ে দিতে গিয়ে সে বলে, "তোমার চিঠি !"

"আমার চিঠি ?" পড়ন্ত বিকেলের রোদ এসে পড়েছিল অর্ণবের মুখে। সেই মিষ্টি রোদেও তার চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা দেখালো চিঠির প্রসঙ্গটা উঠতেই।

"হ্যাঁ, ইরেজিতে গোটা গোটা অক্ষরে তোমার নামই তো লেখা রয়েছে দেখছি খামের ওপরে।"

"এখানে আমাকে কে আবার চিঠি দিতে পারে ?" বিস্ময়ের ঘোরটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি অর্ণব, "কোলকাতার কাউকে তো আমি এখানকার ঠিকানা দিয়ে আসিনি—"

'হয়তো এখানকারই কোন লোক চিঠি লিখে থাকতে পারে, অসম্ভব কিছু নয় !" অত্রীর কথায় রহস্যের ছোঁওয়া, "ঐ যে কথায় আছে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে !"

অর্ণবের আর তর সইছিল না, খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সে তখন। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলে সেটা সে এবার অত্রীর হাতে তুলে দেয়।

অত্রীর কৌতূহলও কম নয় ! দ্রুত চিঠিটা পড়ে ফেলে সে অর্ণবের থেকেও কম সময়ে। তার ঠোঁটে সেই সবজান্তার হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'এখানে আসার সময় বলেছিলাম না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ? কি এবার বিশ্বাস হলো তো ?"

'আশ্চর্য ! এই চাইবাসাতেও ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব আছে নাকি ?" অর্ণব তাচ্ছিল্যের মতো করে বলে, 'এ একেবারে অবাস্তব অত্রী। আজকের বিজ্ঞানের যুগে এসব কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক ভাবাও যায় না।"

"কিন্তু আমি একটা বিদেশী পত্রিকায় পড়েছিলাম," অত্রী বলে, "বৃদ্ধ লোকেরা বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের ফন্দী করে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের রক্ত পান করে থাকে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য, তাদের বার্ধক্যদশা ঘোচানোর জন্য।"

"অসম্ভব কিছু নয়," অর্ণব তার কথায় সায় দিয়ে বলে, "যাইহোক, জঙ্গল থেকে রাকেশ ফিরলে, চিঠিটা নিয়ে আলোচনা করা যাবেখন, আর এই পত্র প্রেরকের সম্বন্ধে কোন খবর সে রাখে কিনা, সেটাও জানা যাবে, কি বলো ?"

সন্ধ্যের একটু আগে রাকেশ ফিরলো। জীপ থেকে নামতেই অর্ণব তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা রাকেশ, তুমি রতন লালকে চেনো ?"

"কোন্ রতন লাল ?"

"তোমাদের এখানেই থাকে, সার্কিট হাউসের কাছে। কাঠের ব্যবসা আছে লোকটার।" অর্ণব ভালো করে বোঝানোর জন্য সেই চিঠিটা তার হাতে তুলে দিলো।

চিঠিটা পড়ার পর রাকেশের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেলো। তার চোখের কোণে চিন্তার ছায়া পড়লো।

"তা চিঠিটা পড়ে তুমি অমন থ মেরে গেলে কেনো রাকেশ ? কোন দুঃসংবাদ—"

"হ্যাঁ দোস্ত, দুঃসংবাদই বটে, বেচারা রতন লাল !" রাকেশ আক্ষেপ করে বলে, "বুড়ো বয়সে বউ মরে যাওয়ার পর আবার সে বিয়ে করে। তার আগের স্ত্রীর একটি ছেলেও আছে, বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়স তার। তার নতুন বউ-এরও একটি পুত্র আছে। এখন এই স্ত্রীকে নিয়েই তার যতো ঝামেলা, যতো বিপদ। তার দ্বিতীয় স্ত্রী আগের স্ত্রীর ছেলেটির ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। সৎ

মায়েদের যা হয়ে থাকে। শুনেছি ভদ্রমহিলা নাকি তার সতীনের ছেলেটিকে দু'দুবার মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছে। তার ভাগ্য ভালো দু'বারই প্রাণে বেঁচে গেছে সে। ভদ্রলোকের আগের স্ত্রীর ছেলেটির ডান পা-টা নাকি দুর্বল যে কোন মুহূর্তে তার পক্ষাঘাত হতে পারে। তাই সে খুঁড়িয়ে চলে।" তারপর রতন লাল এবং তার স্ত্রী পুত্রদের সম্পর্কে রাকেশ সংক্ষেপে যা বললো এই রকম :

রতন লালের স্ত্রীর নিজের ছেলের প্রতি ব্যবহার নাকি আরো বেশি নিষ্ঠুর, আরো বেশি নির্মম, আরো বেশি মারাত্মক। ছেলেটির বয়স বছর দুই হবে। কিছুদিন আগে সেই বাচ্ছা ছেলেটির আয়া তাকে একলা রেখে সার্কিট হাউসে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তার স্বামী সেখানে পরিচারকের কাজ করে। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির কান্না শুনে ছুটে আসে সে। ঘরে ঢোকা মাত্র একটা অদ্ভুত দৃশ্যের

মুখোমুখি হয় সে। চোখে বিশ্বাস করতে পারে না সে। কোনও মা তার নিজের শিশুপুত্রের গলায় কামড় বসাতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে সে বোধহয় বিশ্বাস করতো না। আয়া দেখে, ছেলেটির গলা দিয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে। অমন বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় সে। তারপর সামলে নিয়ে সে তার মনিবকে ডাকতে গেলে মনিবপত্নী তাকে বাধা দিয়ে তার হাতে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে নিষেধ করে দেয়, কথাটা কাউকে যেন সে না বলে।

যাইহোক, কথাটা কাউকে না বললেও ভীষণ ভয় পেয়ে যায় সে। তারপর থেকে সে মনিবপত্নীর ওপর কড়া নজর রাখতে থাকে। এবং সেই বাচ্ছা ছেলেটিকে সে মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করতো না তারপর থেকে।

এর পর বেশ কিছু দিন নির্বিবাদে কেটে যাওয়ার পর একদিন সেই ভয়ঙ্কর দিনটি আসে। তখন সেই ঘটনাটা আর চাপা থাকে না রতন লালের কাছে।

সেদিন সে আয়ার সঙ্গে তার শিশুপুত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করছিল। ছেলেটির স্বাস্থ্য ক্রমশই যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিষয় নিয়েই তাদের সেই আলোচনা। হঠাৎ আলোচনার মাঝে ছেলেটির কাতর কান্না শুনে সঙ্গে সঙ্গে রতন লাল ছুটে যায় তার স্ত্রীর শয়নকক্ষে। তারপর যে দৃশ্য সে দেখে সেটা মোটেই সুখকর নয়। সে দেখে তার স্ত্রী তখন ছেলেটির গলা থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে। ছুটে গিয়ে সে তার স্ত্রীকে টেনে তোলে, আর অবাক বিস্ময়ে দেখে তার স্ত্রীর মুখ ভর্তি রক্ত। সে কি! তার স্ত্রী নিজের ছেলের রক্ত পান করছে? তারপর থেকে রতন লাল তার পিশাচিনী স্ত্রীকে ছেলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আয়াই এখন তার সব দেখাশোনা করে যাচ্ছে। স্ত্রীকে একটা আলাদা ঘরে বন্দী করে রেখেছে সে, ছেলের ত্রি-সীমানায় যেতে দেয় না তাকে।

এই পর্যন্ত বলে রাকেশ থামলো।

রতন লালও তার চিঠিতে সেই রকমই আন্দাজ দিয়ে লিখে অর্ণবকে অনুরোধ করেছে "মিঃ, সেন কোলকাতায় আপনার অনেক নাম-ডাক শুনেছি। খবরের কাগজে পড়েছি, আপনি অনেক জটিল খুনের কেস রহস্যময় ঘটনার সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করেছেন। তাই আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ এই হতভাগ্য শিশুপুত্রটিকে আমার পিশাচিনী স্ত্রীর হাত থেকে রক্ষা করুন, ঈশ্বর আপনার ভালো করবেন। আপনি রাজী হলে সামনা-সামনি আপনাকে আরো বিস্তারিত ভাবে বলতে পারি।"

সেই দিনই রতন লালের চিঠির জবাব দিলো অর্ণব আর এও জানালো পরদিন সকালেই তারা দেখা করছে রতন লালের সঙ্গে। রাকেশের ড্রাইভার চিঠিদিয়ে এলো রতন লালকে।

পরদিন সকালে অর্ণব আর অত্রী গিয়ে হাজির হলো রতন লালের বাড়িতে। বয়স হলেও ভদ্রলোককে আজও বেশ সুপুরুষ বলেই মনে হলো। তবে তার চোখে মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখা গেলো।

কোন ভূমিকা না করেই ভদ্রলোক বললো, "চিঠিতে আপনি আমার অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন মিঃ সেন? জানেন অর্ণববাবু আমি আমার স্ত্রীকে খুব পছন্দ করতাম, দারুণ বিশ্বাস করতাম। অথচ ও আমার বিশ্বাসের কোন মর্যাদা রাখলো না, যে-কোন মুহূর্তে ও আমার সর্বনাশ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনিই বলুন মিঃ সেন, পুলিসে যায় যাওয়া যায় কি? ডাঃ দত্ত," অত্রীর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি তো ডাক্তার, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে এর কোন বিধান আছে কি?"

"না মিঃ লাল আমার যতদূর ধারণা, নেই," বললো ডাঃ অত্রী দত্ত।

"মিঃ সেন, আপনার কি মনে হয়, এ রকম ব্যাপারকে কি বলা যেতে পারে, পাগলামী? নাকি অন্য কোন রোগ? আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আমাকে সাহায্য করুন, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমি—"

"একটুতেই এ ভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না মিঃ লাল," অর্ণব তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে, "আমি আমার সাধ্যমতো অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনার স্ত্রী কি এখনো আপনার ছেলের কাছে যেতে পারেন?"

"না মিঃ সেন। সেদিনের সেই ঘটনার পর আমার স্ত্রী নিজেই ছেলের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর সেই যে সে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে, আর বাইরে আসার নাম নেই। আমার সাথেও তার দেখা নেই তারপর থেকে। তার নিজস্ব পরিচারিকা তার ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়। আর ছেলেটার দেখাশোনা করে আয়া।"

"তাই নাকি ?" অর্ণব বলে, "তাহলে তো আপনার ঐ শিশুপুত্রটির এখন আর কোন ভয় নেই।"

"না তা নেই। তবে শঙ্কর মানে আমার বড় ছেলের জন্য আমি খুব চিন্তিত। তার সৎমা তাকে দু'বার আঘাত করেছিল, সে কথা তো আমি আপনাকে চিঠিতেই লিখেছি, মনে আছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আঘাতটা কি খুব মারাত্মক ছিলো ?"

"না, মারাত্মক না হলেও মাথায় বেশ চোট লেগেছিল তার। আপনাকে বলে রাখি আমার বড় ছেলে

শান্ত। কিন্তু কেন যে আরতি তাকে মারতে গেলো সেটাই আমার কাছে এখনো কেমন রহস্য রয়ে গেছে।"

"মাফ করবেন মিঃ লাল, আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করতে চাই," অর্ণব জিজ্ঞেস করে, "আপনার স্ত্রীর আপনার বড় ছেলের ওপর খুব রাগ, তাই না ?"

"হ্যাঁ, সে রকমই মনে হয়।"

"আপনার স্ত্রী শঙ্করকে কেন মেরেছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁকে ?"

"হ্যাঁ, তবে কোন উত্তর সে দেয়নি।"

"আর একটা কথা মিঃ লাল, জ্যাককে আপনি খুব ভালোবাসেন, তাই না ?"

"হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি বৈকি !"

"আর একটা প্রশ্ন করবো, অর্ণব জিজ্ঞাস করে, "আপনার ঐ শিশুপুত্রটির ওপর আপনার স্ত্রীর আক্রমণ এবং শঙ্করের ওপর আঘাত কি একই সময়ে ঘটে ছিল ?"

"হ্যাঁ প্রথমবারে তাই হয়েছিল, "প্রত্যুত্তরে রতন লাল বলে, "তবে দ্বিতীয় বারে আগে সে শঙ্করকেই মেরেছিল।"

"তাই বুঝি !" অর্ণব নিজের মনে বলে, "এতেই তো ব্যাপারটা আরো বেশি গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।"

"কি বললেন ?" জিজ্ঞেস করলো রতন লাল।

"না কিছু নয়।" অর্ণব বলে, "আপনার কেস আমি গ্রহণ করলাম। এখন আমি আপনার স্ত্রী এবং আপনার শিশুপুত্রের আয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"বেশ তো বাড়ির ভেতরে চলুন," রতন লাল বলে, "তবে আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা জানি না।"

একটা বড় হলঘর পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢুকতে হয়। হলঘরটা পেরিয়ে আসতে গিয়ে অর্ণব বলে, "হলঘরে ঢোকার সময় দেখলাম, একটা স্প্যানিয়েল কুকুর খোঁড়াতে খোঁড়াতে আপনার কাছে এগিয়ে এলো, কুকুরটা ওভাবে খোঁড়াচ্ছিল কেন মিঃ লাল ?"

"ডান পাটা একটু মুচকে গেছে," রতন লাল বলে, "এখানকার পশু চিকিৎসক বলেছে, খুব শীগগীর ও আবার স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে।"

"তা ওর পাটা কি হঠাৎ মুচকে গেছে মিঃ লাল ?"

"হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন রাত থেকে।"

"কতদিন আগে ঘটনাটা ঘটে?" অর্ণব জিজ্ঞেস করে।

"তা প্রায় একমাস আগে হবে।" রতন লাল বলে।

"একমাস আগে?" অর্ণব গম্ভীর হয়ে বলে, "ব্যাপারটা তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।"

"কি বললেন?"

"আমি যা ভেবেছিলাম, তা ঠিক কিনা তাই ভাবছি।"

"আপনার মনের কথা আমি ঠিক জানি না মিঃ সেন," রতন লাল বলে, "তবে আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন দয়া করে।"

অর্ণব তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে, "মিঃ লাল, আমি বেশ ভালো করেই জানি, সমস্ত ব্যাপরটা পরিষ্কার হয়ে গে'লে আপনাকে খুব দুঃখ পেতে হবে।"

সেই সময় একজন পরিচারিকা তাদের কথার মাঝে এসে দাঁড়াতেই রতন লাল নিচু গলায় তাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। তারপর অর্ণবের দিকে ফিরে বললো, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, দেখি আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করে কিনা!"

খানিক পরে সেই পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে রতন লাল ফিরে এলো। তার মুখটা কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। "না মিঃ সেন, ও নারাজ, দেখা করবে না।"

অর্ণব তখন সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার মনিবপত্নী আমার বন্ধু ডাঃ অত্রী দত্তর সঙ্গে দেখা করবেন বলে মনে হয়?"

"তাহলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হয়।" পরিচারিকা বলে।

পরিচারিকাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে যায় অত্রী। মিসেস লালের ঘরে ঢুকতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমার স্বামী কোথায়? আপনি কে?"

"তিনি নিচে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ডাক্তার দত্ত।"

"না না ওর সঙ্গে আর কোন কথা নয়। সব শয়তান, ওরা সব শয়তানের দল।" বিড় বিড় করে আপন মনে বলতে থাকে সে।

"আচ্ছা আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি আপনাকে?"

"না, এখন আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমার। সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আমার সন্তানকে চাই, ওর ওপর আমার অধিকার আছে, ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।"

অতঃপর ব্যর্থ হয়ে অত্রী নিচে ফিরে এলাম। রতন লালকে সব খুলে বললো অত্রী। উত্তরে সে বললো, "অসম্ভব! এ হতে পারে না। জেনেশুনে শিশু-হত্যা দেখতে, আমি ঐ রক্তপিপাসু স্ত্রীর কাছে আমার ছেলেকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না।"

সেই সময় একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে ছুটে এসে রতন লালকে জড়িয়ে ধরলো। ছেলেটির সঙ্গে সে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। অর্ণব লক্ষ্য করে শঙ্কর ছেলেটি যেন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।

"আপনার অপর শিশুপুত্রটি কোথায় মিঃ লাল?" অর্ণব জিজ্ঞেস করলো।

"শঙ্কর আয়াকে বলো তোমার ছোট ভাইকে এখানে নিয়ে আসতে।" রতন লাল বললো।

শঙ্কর তাদের দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। ওরা তখন ড্রইংরুমে বসেছিল, হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকাতে গিয়ে অর্ণব জিজ্ঞেস করলো, "ঐ তীর ধনুকগুলো কোথ্-

থেকে পেলেন মিঃ লাল ?"

"আমার স্ত্রী এখানকার সাঁওতাল অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে।" রতন লাল বলে।

সেই সময় একটি শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো আয়া।

অর্ণব মুগ্ধ চোখে সেই বাচ্ছা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় সে বলে, বাঃ ভারী সুন্দর ছেলে তো আপনার ?" তারপর ছেলেটির গলা পরীক্ষা করতে গিয়ে সে বলে, "মিঃ লাল, আপনার স্ত্রীর সাথে এখুনি আবার একবার দেখা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

"কিন্তু ও তো না করে দিয়েছে মিঃ সেন !"

"এখন আর করবে না," অর্ণব বলে, "একটা কথা আপনাকে বলে রাখি মিঃ লাল, আপনার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী, আর তিনি আপনাকে এখনো খুব গভীর ভাবে ভালোবাসেন।"

"আপনি বুদ্ধিমান" রতন লাল আনন্দে চিৎকার করে ওঠে "আমার স্ত্রীকে আপনি তাহলে ঠিকই চিনতে পেরেছেন।"

"হ্যাঁ, গোড়াতেই আমি চিনেছিলাম," অর্ণব তাড়া দেয়, "চলুন, এবার ওপরে যাওয়া যাক।"

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে অর্ণব বলে, "একটা কথা আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখি, এ কেসের সমাধানের শেষে আপনাকে কিন্তু অন্য দিক থেকে বেশ আঘাত পেতে হবে। সে আঘাত আপনি সহ্য করতে পারবেন তো ?"

"মিঃ সেন, আমি সব কিছু সহ্য করতে রাজী আছি," রতন লাল অধৈর্য হয়ে বলে, "আপনি আর আমাকে অযথা ঝুলিয়ে রাখবেন না !"

"বেশ তাহলে শুনুন।" অর্ণব আর কোন ভূমিকা না করে বলে, "আচ্ছা মিঃ লাল, আপনার স্ত্রীকে ঐ বাচ্ছা ছেলেটির গলা কামড়াতে দেখে আপনার কি একবারও মনে হয়নি রক্ত চোষার জন্য নয়, তার দেহ থেকে বিষ টেনে বার করার জন্যই রক্ত টেনে নিচ্ছিলেন তিনি।"

"বিষ টেনে বার করার জন্য ?" মিঃ লাল অবাক হয়ে বলে, "এসব আপনি কি বলছেন মিঃ সেন ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই মিঃ লাল। আপনার বড় ছেলে শঙ্কর ঐ সাঁওতালদের তীর বিঁধে দিয়েছিল ঐ ছেলেটির গলায়। আর আমরা সবাই জানি, সাঁওতালদের তীরে মেশানো থাকে তীব্র বিষ। এ ঘরে ঢুকে দেওয়ালে তীর ধনুক ঝুলে থাকতে দেখেই আমি চিনেছি। যে ধারণা নিয়ে আমি এই কেসটা শুরু করি এখানে এসে ঐ তীরগুলি দেখে আমার সেই ধারণা আরো বেশি বদ্ধমূল হয়েছে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি মিঃ লাল ?"

"আমি ভাবছি, শঙ্কর কেন এ কাজ করতে গেলো ?"

"হিংসায় উন্মত্ত হয়ে।" অর্ণব বলে, "আপনার স্ত্রী সেই দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে শঙ্করকে মারে। উনি আপনার কাছে এ ব্যাপার সম্পূর্ণ চেপে যান এই কারণে যে, তিনি জানতেন শঙ্করকে আপনি খুব গভীর ভাবে ভালোবাসেন। তাই এমন দুর্ভাগ্যজনক খবরটা পেয়ে যদি আপনি আঘাত পান। তারপর আপনার স্ত্রী ছেলেটির রক্ত চুষে বার করে ফেলেন। আর সেই সময়েই আপনি তাঁকে দেখে ফেলেন। বলুন আমি কিছু ঠিক বলছি কিনা ?"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।" রতন লাল বলে, "কিন্তু আমি ভাবছি এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মিঃ সেন ?"

ইতিমধ্যে ওরা মিসেস লালের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তবে এখানে আসার

আগে অর্ণব একটা কাগজে কিছু লিখে পাঠালো মিসেস লালকে।

ঘরে ঢুকতেই মিসেস লাল ছুটে এলেন অর্ণবের কাছে। একটু আগের সেই উত্তেজনা সেই রাগ আর নেই। স্বাভাবিক মহিলার মতো উদ্বেগভরা তাঁর কণ্ঠস্বর, "আপনি তাহালে সব জানতেন মিঃ সেন ?"

"হ্যাঁ মিসেস লাল," অর্ণব বলে, "আপনার স্বামীও সব শুনেছেন।"

"আরতি, তুমি আমাকে এ সব কথা আগে বলোনি কেন ?" অনুযোগের সুরে বললো রতন লাল।

প্রত্যুত্তরে মিসেস লাল বলে, "আমার আশঙ্কা ছিলো, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।"

"আপনার বড় ছেলে শঙ্করকে অন্য কোথাও চেঞ্জে পাঠালে ভালো হয়, ওর মনটা ঘুরে যাবে তাহলে।" বললো অর্ণব।

(১২৫ পৃষ্ঠার শেষাংস)

অগ্নিদগ্ধ শরীর। কানের পর্দায় আঘাত লেগেছে। পক্ষাঘাত হলে যেমন হয় তেমন! হিটলার বুঝতে পারলেন তাঁর সেনাপতির অধিকাংশ তাঁর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং জেনারেল রোমেল এর পাণ্ডা। তিনি কৌশল করে রোমেলকে আফ্রিকা থেকে প্যারিসে ডেকে পাঠান তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে বলে। কিন্তু প্যারিসে এক আততায়ীর হাতে রোমেলকে প্রাণ দিতে হয়।

এই ঘটনার পর হিটলার তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু মুসোলিনী-কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি বেঁচে থাকি এবং আমার উপর তিনি যে মহান কাজকর্ম অর্পণ করেছেন তা যেন পালন করে যেতে পারি।" কিন্তু হায় হিটলার! তাঁকেও শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক ভাবে পৃথিবী থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হয়। তবে নিজের হাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সেই অন্তিম রহস্য পৃথিবীর লোকের কাছে আজও অজানা !!!

শব্দ মালা | প্রদীপ দত্ত

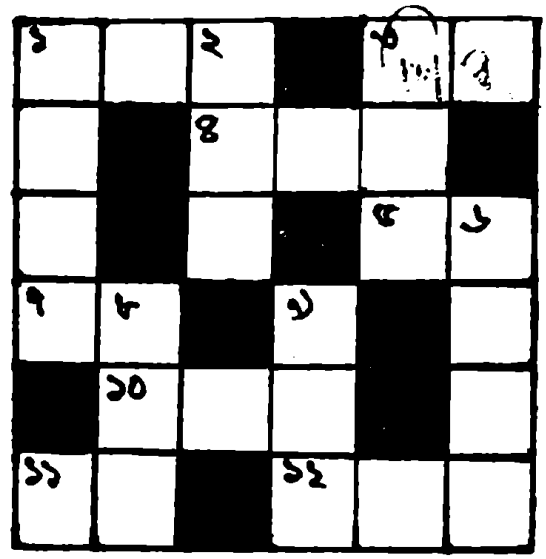

পাশাপাশি : সূত্র :- (১) অস্ট্রিয়ার জাতীয় পাখী, (৩) পার্বতীর স্বামী,, (৪) পায়চারি, (৫) ধার্মিক, (৭) লক্ষ্মীদেবী, (১০) ধনদেবতা কুবের, (১১) জলচর পক্ষী, (১২) চামেলী ফুল।

উপর নীচ : সূত্র :—(১) পূজার উপকরণ সহ, (২) ঝুটিওয়ালা পারাবত, (৩) নৃত্যগীতাদির বৈঠক, (৬) দশমহাবিদ্যার একটি, (৮) বসন্তকাল, (৯) উপনেত্র।

উত্তর আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যায় বিষ্ণু দত্তের তৈরী ছকের উত্তর।

পাশাপাশি :

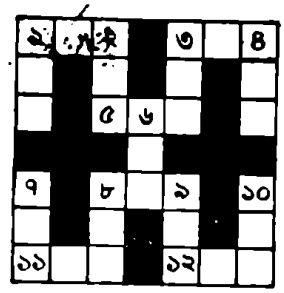

(১) মার্জার, (৩) খেলনা, (৫) নধর, (৮) কাকলি, (১১) ধবল, (১২) রসিক।

উপর নীচ : (১) মাদুর, (২) রঞ্জন, (৩) খেচর, (৪) নাটক, (৬) ধনুক, (৭) ন্যগ্রোধ, (৮) কাবুল, (৯) লিটার, (১০) পেচক।

জগবন্ধু হালদার

কথায় বলে ঢেঁকিকে স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে হয়। গোয়েন্দা তিমির একজন ব্যস্ত মানুষ। নানান রকমের কেসের কিনারা করতে তাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

কয়েক দিন থেকে তার কাজের চাপটা একটু কমেছে। এই সুযোগ। কলকাতার বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার! কিন্তু কোথায় যাবে? বেশিদূর তো যাওয়া চলবে না। বেশি দিন বাইরে কাটাবার সুযোগ নেই তার। কাছাকাছি বলতে এক দিদির বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। তাই ঠিক হল। হাওড়া স্টেশনে হাজির হল গোয়েন্দা তিমির। মনটা বেশ হালকা লাগছিল তার! যত সব খুন-ডাকাতির কেসের জট ছাড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে মনটা সেই জটের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। সব ঝেড়ে ফেলে একটা মুক্তির আনন্দ পাচ্ছিল আজ। খুশি খুশি ভাব তিমির বরণের।

কিন্তু ঐ—স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে হয় ঢেঁকিকে। গোয়েন্দা তিমির ভাবতেও পারল না যে, একটু পরেই মোকাবিলা করতে হবে একটা নতুন ঝামেলার।

তার যত আনন্দ প্রথমেই চোট খেল লোকাল ট্রেনে ওঠার সময়। সব আনন্দ চিড়েচ্যাপ্টা হবার যোগাড় তারকেশ্বর লোকালের ভিড়ের চাপে। তিমির অবশ্য একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল। ভাল জায়গা। জানলার ধারেই। হলে হবে কী? চারিদিকে চলছে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, হুটোপাটি। কেউ কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তার গায়ের ওপরে। গাড়ি ছাড়ল। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল, পকেট মার—পকেট মার—

তিমির ফিরে দেখে তার প্রায় সামনেরই লোকটা

চেঁচাচ্ছে। ওর হাতে বিরাট একটা প্লাস্টিকের ঘোড়া। সবুজ রঙের ঘোড়া। ভিড়ের চাপে ঘোড়াটা দুমড়ে যাবার ভয়ে লোকটা ওটাকে এক হাতে উঁচু করে মাথার ওপরে তুলে ধরেছে আর অন্য হাতে তার পাশের লোকটার কলার চেপে ধরে চেঁচাচ্ছে, পকেটমার—পকেটমার—

পকেটমার লোকটা প্রায় বৃদ্ধ। তিমির অবাক হল, এই বয়সেও পকেটমারার অভ্যেস? বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবশ্য হতেও পারে। এ জগতে কি না হয়? বিশ্বাস অন্যান্য যাত্রীদেরও হচ্ছিল না। বুড়ো মানুষ পকেট মারবে? কী? মারের ভয় নেই? কেউ কেউ ঘোড়াওলা লোকটাকে শুধাল, ও যে আপনার পকেট মেরেছে তার প্রমাণ কী মশাই?

ঘোড়াওলা বলল, হ্যাঁ প্রমাণ আছে।

তিমির বরণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ভাবল, বাঁচা গেল বাবা। প্রমাণ যখন তুমি নিজেই করে ফেলছ গোয়েন্দা হিসেবে অমোর আর কিছু করার থাকল না।

লোকে বলে, প্রমাণ কি!

ঘোড়াওলা বলল, এই মাত্র আমার পকেট থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে ও নিজের পকেটে ঢুকিয়েছে। বিশ্বাস না হয় দেখুন আপনারা। ওর পকেট হাতড়ে দেখুন, আমার একশ টাকার নোটটা বেরিয়ে পড়বে।

—থাকলেও সেটা আপনার টাকা কী করে বুঝবো? বুড়োর নিজের টাকা থাকতে পারে না?

ঘোড়াওলা জোরের সঙ্গে বলল, আপনারা তো বেশ লোক মশাই, পকেটমারকে সাপোর্ট করছেন? আমার টাকা আমি জানবো না? আমার নোটের নম্বর পর্যন্ত বলে দিতে পারি—D 367122 হচ্ছে আমার নোটের নম্বর। একশ টাকার নোট। দেখুন আপনারা মিলিয়ে।

এবার সবাই মিলে চেপে ধরল বুড়োকে। একজন জোর করে বুড়োর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকোল। সত্যি একশো টাকার নোট পাওয়া গেল। এবং নোটের নম্বরও মিলে গেল। ঘোড়াওলা নোটটা ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

ঠিক সেই সময়ে পকেটমার বুড়ো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, হাই ভগবান আমার হার কী হল—আমার হার কোথায় গেল?

সবাই অবাক, হার? কিসের হার?

—সোনার হার।—বুড়ো বলল। মেয়ের বিয়ের জন্যে কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ছোট প্যাকেটে করে পকেটে রেখেছিলাম। হায় ভগবান, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আর আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না।

ঘোড়াওলা তার ঘোড়াটা মাথার ওপর তুলে ধরে চিৎকার করছে, মশাইরা, ওটা বুড়োর বাহানা। এখন বাঁচবার জন্যে বলছে, তারও পকেটমার গেছে।

যাত্রীরা বুড়োর ওপর ক্ষেপে উঠল। বড় চালাক বুড়ো। বুড়োকে এই মারে তো সেই মারে।

তিমির বরণ এতক্ষণ চুপচাপ বসে গোটা ব্যাপারটায় লক্ষ্য রাখছিল। এবার সে বলে উঠল, থামুন আপনারা। মারধর শুরু করার দরকার নেই।

ঘোড়াওলা তিমিরের ওপর ক্ষেপে উঠল। বলল, নেই মানে? আপনি কে মশাই? চোর বুড়োকে বাঁচাতে এসেছেন? নিশ্চয় আপনি বুড়োর সাগরেদ—ওর দলের লোক।

—বটেই তো।—যাত্রীরা সমর্থন করল ঘোড়াওলাকে।

তিমির ঘোড়াওলাকে শুধাল, আপনি কি সবসময়েই

আপনার টাকার নাম্বার মনে রাখেন ?

ঘোড়াওলা বলল, না রাখলে আমি বললাম কী করে ?

—আমিও তাই ভাবছি।—তিমির বলল, ছয় সংখ্যার একটা নম্বর মনে রাখা সবার পক্ষেই অস্বাভাবিক। ওটা আপনি মুখস্থ করে রেখে ছিলেন। এবং তার পেছনে নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল।

তাতে হয়েছে কী? আমার নোটের নম্বর আমি মুখস্থ করে রাখতে পারি, যা খুশি তাই করতে পারি—আপনার কী?—বলতে বলতে ঘোড়াওলা ভিড় ঠেলে দরজার দিকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

বুড়ো তখনো কান্নাকাটি করছে তার হারের জন্য।

তিমির বরণ ঘোড়াওলাকে বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়ান আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

ঘোড়াওলা বলল, আমার এই সামনের স্টেশনে নামবার আছে।

তা নামুন। কিন্তু আপনার পকেটমার বুড়োকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন ? আপনি তো বড় দয়ালু লোক দেখছি ?

—আমি আমার টাকা ফিরে পেয়েছি।

—তা পেয়েছেন। কিন্তু বুড়োর হারটা যে পাওয়া যায় নি ?

—তা আমি কী করবো ? ও মিথ্যে কথা বলছে।

তিমির শুধাল, আপনি কি এই হিন্দমোটর স্টেশনে নামবার জন্যেই গাড়িতে উঠেছিলেন ?

ঘোড়াওলা বলল, নইলে আর নামছি কেন ?

—দেখি আপনার টিকিট।—তিমির হাত বাড়াল।

—আপনি আমার টিকিট দেখবার কে ?

—আমি কে যথাসময়ে জানতে পারবেন।

তখন কয়েকজন লোক ঘোড়াওয়ালাকে বলল, দেখান না মশাই। টিকিট দেখাতে আপত্তি কী ?

ঘোড়াওলা তখন পকেট থেকে টিকিট বার করে দেখাল।

তিমির বলল, আপনি তো শেওড়াফুলির টিকিট করেছেন। এত আগে নামছেন কেন ?

—সে আমার খুশি। এখানে আমার কাজ থাকতে পারে না ?

—নিশ্চয় পারে। কিন্তু হিন্দ মোটরে কাজ সারবার জন্যে কেউ শেওড়াফুলির টিকিট কাটে না। মানে স্বাভাবিক নয়। যাকগে, এবার বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হারটা বার করে দিন।

ঘোড়াওলা রুখে দাঁড়াল, মিথ্যে কথা। আমি কারো হার নিইনি। আপনারা সবাই আমার পকেট সার্চ করে দেখে নিতে পারেন।

তিমির বলল, হার আপনি পকেটে রাখেন নি। যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে বার করে দিন।

—কোথায় রেখেছি ?

আপনিই ভাল জানেন।

ঘোড়াওলা রেগে গেল, মুখ সামলে কথা বলুন মশাই। যদি বলেন আমি নিয়েছি, আপনিই বার করে দেখান না কোথায় রেখেছি।

—ব্যস ব্যস। আপনার এই অনুমতিটুকুই আমি পেতে চাচ্ছিলাম।—তিমির শুধাল, আচ্ছা আপনি এই ঘোড়াটা পেলেন কোথায় ?

—কেন কিনে আনতে পারি না ?

—নিশ্চয় পারেন। কিন্তু কী জন্যে ?

—দরকার না থাকলে কিনবো কেন ?

—বটেই তো। বিনা দরকারে কেউ ঘোড়া কিনেছে আজ পর্যন্ত ? কিন্তু কী দরকার ?

—প্লাস্টিকের ঘোড়া লোকে কী জন্যে কেনে ? বাচ্চার খেলার জন্যে।

তিমির বলল, ঘোড়া কি শুধু বাচ্চার খেলার জন্যেই কেনে লোকে? রাজা কেনে যুদ্ধ করার জন্যে, ডাকাত কেনে লুট করার জন্যে আর আপনি কিনেছেন পকেট মারার জন্য—কী ঠিক বলছি না?

—আপনার সঙ্গে বাজে তর্ক করার সময় নেই আমার। আমাকে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে দিন। সামনের স্টেশনে নামতে হবে।

—আপনার নামার ব্যবস্থা আমিই করে দেবো। দরকার হলে আপনার সঙ্গে পুলিস দেবো। এবার আপনার হাতের ঘোড়াটা আবার মাথার ওপরে তুলুন দেখি, কিছুক্ষণ আগে যেমন ধরেছিলেন উঁচু করে।

ঘোড়াওলা ডান হাতে ঘোড়াটা মাথার ওপরে তুলল।

তিমির বলল, না না ওভাবে নয়। গাড়ির ঐ বাতিটা জ্বলছে ঠিক তার নীচে তুলে ধরুন ওটাকে।

ঘোড়াওলা তাই করল। আলোর সামনে প্লাস্টিকের ঘোড়াটা তুলে ধরতেই দেখা গেল ঘোড়ার পেটের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি মোটা এক বস্তু—তার কালো ছায়া পড়েছে ঘোড়ার পেটে।

তিমির বরণ শুধাল, এবার বলুন তো ওটা কী?

ঘোড়াওলা বলল, দূর মশাই। খেলনা বাজবে না? জানেন না শোনেন না কথা বলেন। নড়ালে বাজবে বলে পুতুলের পেটে শক্ত জিনিস ঢোকানো থাকে।

—সে তো পাথরকুচি। ঝুন্ ঝুন্ আওয়াজ হবে তার। আপনার ঘোড়ার পেটে যে ঢক্ ঢক্ আওয়াজ হচ্ছে। আচ্ছা আপনার ঘোড়ার গায়ে এই বোতাম দুটো কী জন্যে?

বলেই তিমির টান দিয়ে বোতাম দুটো খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পাঁজরাটা ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘোড়ার পেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করল। সেটাকে আবার খুলল, ভেতরে সোনার হার। তিমির বৃদ্ধ লোকটাকে শুধাল,এই আপনার হার?

বুড়ো হাঁ-হাঁ করে উঠল, আজ্ঞে হ্যাঁ সার, এই আমার হার! আপনি যে আমার কী উপকার করলেন? এটা না পেলে আমার মেয়ের বিয়ে ভেস্তে যেত।

তিমির হাত বাড়াল, কই আপনার ক্যাশ মেমো?

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে হারের ক্যাশমেমো বার করে দেখাল। ঠিক সেই সময়ে গাড়ি হিন্দ মোটর স্টেশনে এসে ঢুকল। তিমির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দুজন রেল পুলিসকে ডেকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, এই ঘোড়াওলাকে লক-আপে রাখার ব্যবস্থা কর।

পুলিস ঘোড়াওলাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। গাড়ি আবার চলতে লাগল।

তিমির বুড়ো ভদ্রলোককে বলল, আপনার হার নিয়ে যান। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুনগে। কিন্তু তৈরী হয়ে থাকবেন। ব্যাটা ঘোড়াওলার বিচারের দিনে আপনাকে একটা সাক্ষী দিতে হতে পারে।

বৃদ্ধ বলল, আমার ঠিকানাটা তা হলে রাখুন সার।

—দরকার নেই। আপনার ঠিকানা আপনার ক্যাশ মেমোতেই দেখে নিয়েছি।

বৃদ্ধ এবার একটা কৌতূহল প্রকাশ করল, কিন্তু পকেটে ঘোড়াওলার টাকা এল কী করে?

তিমির বলল, ব্যাটা বড় চালাক। আপনার পকেট মেরে আপনাকেই চোর সাব্যস্ত করার জন্যে নিজের টাকা আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে ছিল। যাতে আপনার সোনার হারটা ও নিয়েছে সে কথা কেউ বিশ্বাসই না করে। সাজানো ব্যাপার আর কী। নইলে টাকার নাম্বার কেউ স্মরণ রাখতে পারে?

শয়তান ও টারজান | অভীক মিত্র

শয়তান ও টারজান

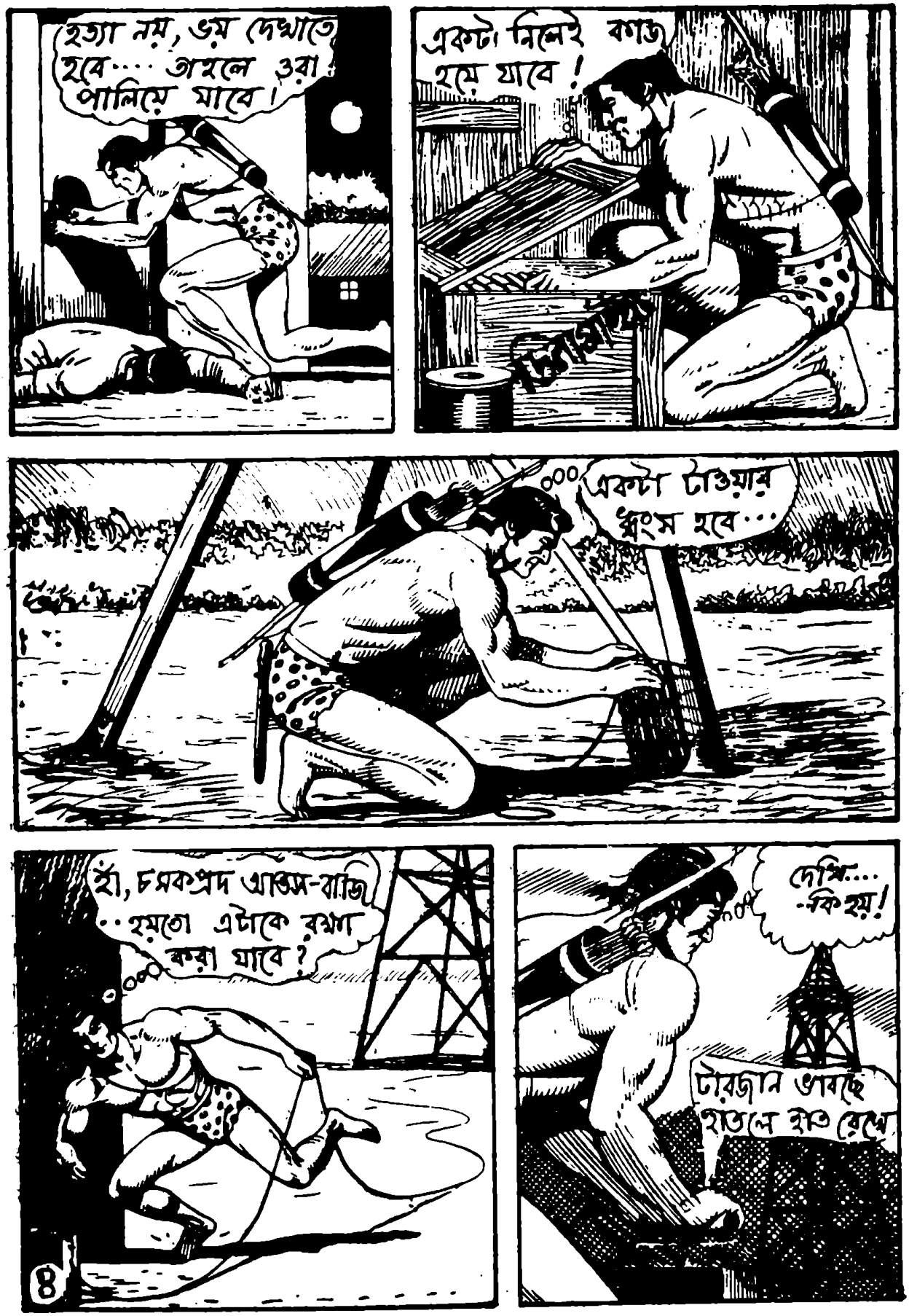

হত্যা নয়, ভয় দেখাতে হবে... তাহলে ওরা পালিয়ে যাবে!
একটা নিলেই কাজ হয়ে যাবে!
একটা টাওয়ার ধ্বংস হবে...
হাঁ, চমকপ্রদ আতস-বাজি ...হয়তো এটাকে রক্ষা করা যাবে?
দেখি.... -কি হয়!
টারজান ভাবছে হাতলে হাত রেখে.

আত্মরক্ষা

প্রভাস মল্লিক

সুরজিতদার টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দ আর ধরেনা, লিখেছে আমি যেন পত্রপাঠ জগদীশপুর রওয়ানা হই। সবে বি, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছি। হাতে অফুরন্ত সময়। সুরজিতদার মত অত বড় গোয়েন্দার যদি কোন সাহায্যে আসি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। মধুপুর-গিরিড়ি লাইনে এক ছোট স্টেশন হল জগদীশপুর। এখানে সুরজিতদাদের একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি আছে, সেখানে অবসর পেলেই সুরজিতদা চলে আসে। আমিও এর আগে বার দুই এসেছি জগদীশপুরে।

কলকাতা থেকে মধুপুরে এসে শুনলাম গিরিড়ির সন্ধ্যার ট্রেন চলে গেছে। শেষ ট্রেনে যখন জগদীশপুরে নামলাম তখন রাত্রি বারটা বাজে। আমি ছাড়া দু চার জন দেহাতি লোক নামলো। ট্রেন ছেড়ে যেতেই সব অন্ধকার। টিকিট ঘরের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল। সুরজিতদাকে স্টেশনে আশা করেছিলাম। পায়ে পায়ে সুটকেশ হাতে এগিয়ে চলেছি। তা সুরজিতদার বাংলো আধ মাইলের পথ হবে। ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা জংলী জায়গা। বাঁদিকে বাগান ঘেরা কটা সাজানো বাড়ি। বছরের বেশী ভাগই মালীদের তদারকে পড়ে থাকে। একটু পেছনে জঙ্গল। একটা নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে দূরের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। জন্তু জানোয়ার বার হবার কথা অনেক শুনেছি। গা ছম্ ছম্ করছে। আমার হাতিয়ার বলতে একটা স্প্রিং দেওয়া ছুরি ও দু শেলের একটা টর্চ।

রাস্তার দুদিকে গাছ। চাঁদের মৃদু আলোতে গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপর। বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটি ভিজে। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে।

হঠাৎ মনে হল আমার সামনে প্রায় এক শ গজ দূরে দুটো লোক চলেছে। ভেবে ছিলাম গ্রামের লোক বোধ হয়। কিন্তু হঠাৎ তারা একটা গাছের পাশে গা ঢাকা দিলো। আমিও চকিতে একটা গাছের পাশে সরে গেলাম। না আমায় দেখতে পায়নি। মনে হল যেন ওরা কার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই জনমানবশূন্য রাস্তায় ওদের দেখে ভয় হল। মনে হল ওদের হাতে যেন দেখলাম তীরধনুক। পেছনেও মনে হল কার পায়ের শব্দ পাতার ওপর। আমি কি করব বুঝতে পারছি না।

দূরে সুরজিতদার বাংলো দেখা যাচ্ছে। খড়খড়ির ভেতর থেকে আলো বাইরে পড়েছে। সম্ভবতঃ সুরজিতদা এত রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে আছে আমার অপেক্ষায়। ভাল করে চেয়ে দেখি লোক দুটো

সুরজিতদার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। তবে কি ওরা সুরজিতদার বাংলোর ওপর নজর রাখছে! টেলিগ্রাম তবে কি সুরজিতদা করেছে কোন বিপদে পড়ে! কাছেই কটা শেয়াল-কেউ ডাকতে শুরু করলে। পেছনে কার পায়ের শব্দ আবার কানে এল। সামনে লোক, পেছনে আবার কে অনুসরণ করছে কে জানে, তার ওপর শেয়ালের পাল কাছেই। আমি সন্তর্পণে আমগাছটার কাণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। একটা উঁচু ডালে বসে লোক দুটোর দিকে নজর রেখেছি। তা প্রায় পনের কুড়ি মিনিট হবে। মশায় কামড়ে গা জ্বলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি লোক দুটো গেট টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার সঙ্গে আরও কজন লোক মশাল হাতে বেড়া টপকে সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। তারা দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগল। কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে একজন গাঁইতি হাতে এগিয়ে গেল। আমি কি করব বুঝতে পারছি না। এদের সুরজিতদার ওপর কি আক্রোশ থাকতে পারে? সুরজিতদা নিশ্চয় টেলিগ্রাম করেছিল এই রকম বিপদ আশঙ্কা করে। কি কুক্ষণে আমি শেষ ট্রেনে এলাম। এর আগের ট্রেনে এলে হয়ত কোন রকম সাহায্য করতে পারতাম।

শুনেছিলাম গত বছর এক সাঁওতাল খুনীকে সুরজিত ধরিয়ে দেয় ও তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তবে কি সেই আক্রোশে এরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই নির্জন বাংলোয় একা থাকা উচিত হয়নি সুরজিতদার, কাছাকাছি কোন বাড়িতে লোকই নেই যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। ঐ বিপদে বাধ্য হয়ে সে গুলি চালাবে—তাতে দুই একটা ঘায়েল হলেও বাকি লোকেরা ছাড়বে না। ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সুরজিতদার এই বিপদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব? আমি নড়ে বসলাম ও আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করছি, ডাকাতরা তখনও বাংলোর ভেতর। হঠাৎ কানে এল, 'শঙ্কর গাছ থেকে নেমনা, ওপরে উঠে পড়।' একি সুরজিতদার গলা। আচমকা শুনে আমি গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোন রকমে একটা ডাল ধরে ফেল্লাম। ধড়ে প্রাণ এল। বাঁচা গেল, তা হলে সুরজিতদা বাংলোয় নেই, ডাকাতরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সত্যি সুরজিতদার মত বিচক্ষণ লোককে এত সহজে ঘায়েল করা সোজা নয়। তবে বুঝতে পারছি না এই বিপদের আঁচ যদি করে থাকে, কেন পুলিসের সাহায্য নিলে না সুরজিতদা।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখলাম ডাকাতের দল উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যতদূর মনে হল ঐ ছোট পাহাড়টার দিকে ওরা এগিয়ে চলেছে মশাল হাতে। যখন ওদের আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না তখন আবার সুরজিতদার স্বর ভেসে এল, শঙ্কর খুব সন্তর্পণে নেমে আয়। দেখি একটা গাছের আড়ালে সুরজিতদা দাঁড়িয়ে। বললে, খুব বেঁচে গেছিস। সন্ধ্যার ট্রেনে এসে বাংলোয় ঢুকতে গেলে ওরা তোকে পুলিসের লোক সন্দেহ করে মেরে ফেলত। যাক এখন এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই সামনের ছোট বাড়িটায় যেতে হবে। খুব সাবধান, ওদের লোক এখনও পাহারা দিচ্ছে।

সুরজিতদার পেছু পেছু পেছনের একটা দরজার তালা খুলে ঢুকলাম একটা ছোট ঘরে। দেখি দুটো খাটিয়া পাতা। এ বাড়িটা কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়ির বসাকদের। আসবার সময় চাবি চেয়ে এনেছিলাম। খুব কাজে লেগে গেল;

সুরজিতদা বলে ফিস্ ফিস করে।

আমি বললাম কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি এত বিপদে পড়েছ অথচ পুলিসকে খবর দাওনি।

সুরজিতদা বলে, তবে বলি শোন। তুই জানিস আমাদের দু বিঘে জমি আছে বাংলোর পশ্চিম দিকে। বিশ পঁচিশ বছর আগে বাবা কিনেছিলেন এক সাঁওতাল সর্দার রঘুর কাছ থেকে। রঘু মরে গেলে ওর ছেলে বুধু এখন এক দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়েছে। আমি এখানে এলেই জমিটা ফেরৎ চায়। বলে, আমার বাবা ওর বাবাকে ঠকিয়ে জমিটা নেন, কিন্তু আমি রেজিস্টারি অফিসে দিয়ে দেখি বাবা নায্য দাম দিয়েই জমিটা কিনে ছিলেন ও তার পরচা আমার কাছে আছে। এবার এখানে আসতেই এক বেহারী ধনীলোক নাম রতন পাল সিং জমিটা কিনতে চায়। ও বলে সে বুধু সর্দারকে মোকাবিলা করবে। আমি তোকে আসতে বলি কারণ তুই থাকলে রেজিস্টারি করার সময় সুবিধে হবে। রতন পাল কালই হঠাৎ জমিটা রেজিস্টারি করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কাল নাকি খুব ভাল দিন ছিল। ও সেই টাকাটা যখন আমায় দিয়ে গেল তখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। এই বুধু ডাকাত জানতে পারে যে রতনপাল টাকাটা আমার বাড়িতে দিয়ে গেছে। এও-হতে পারে যে রতন পালের সঙ্গে ওর সড় আছে। আমি গিরিড়ি থানার ও. সি. কে ফোনে ধরি এখানকার ফাঁড়ি থেকে, টাকাটা আমার হাতে আসার আগে। ইনসপেকটার শর্মা আমার পরিচিত লোক, ওকে আমি দুটো কেসে সাহায্য করি। কিন্তু শর্মা জানায় থানায় সুপার ইনসপেকসান করছে তাই তার পক্ষে থানা ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। তবে ও কথা দিয়েছে ও যত শীঘ্র পারে আসবে। এই সাংঘাতিক ডাকাত দলের সঙ্গে মোকাবিলা করা আমার একার পক্ষে অসম্ভব। টাকাটা দিয়ে যাবার পর থেকেই ওদের দলের লোক বাংলোর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এখান থেকে সরে পড়া সোজা নয়। বিষাক্ত তীর ধনুক নিয়ে ঘুরছে, অভ্রান্ত ওদের লক্ষ্য। তারপর তুই যখন সন্ধ্যায় বাংলোয় ঢুকতে যাবি তখন তোকে আক্রমণ করবেই। সন্ধ্যার পর যখন পেছনের দিকে যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল তাকে তাড়ি খেতে ঝোপের দিকে যেতে দেখি, আমি জীবন বিপন্ন করে উঠানের এই আম গাছে উঠে দড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়ি। স্টেসনে একটা লম্বা মালগাড়ি আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় তোকে দেখতে পাইনি যখন তুই ট্রেন থেকে নেমেছিলি। দূরে তোকে রাস্তায় চিনতে ভুল হয়নি কিন্তু তোকে সতর্ক করে দেবার উপায় ছিল না। যাক যখন ওদের সন্দেহ করে তুই গাছে উঠে পড়লি তখন আমাকেও একটা গাছে উঠতে হল, কারণ শেয়ালের ফেউ ডাকার সময় ওদের একজন জঙ্গলের দিক থেকে আমার খুব কাছে এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ সুরজিতদা কান খাড়া করে কি শুনলে ও বলে উঠল "পুলিশের ও. সি. শর্মার জিপের শব্দ।" হ্যাঁ তাই তো শীঘ্রি একটা জিপ ও একটা পুলিস ভ্যান এসে দাঁড়ালো, সুরজিতদার বাংলোর সামনে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শর্মা বল্লে "মিঃ সান্যাল খুব দুঃখিত এর আগে আসতে পারলাম না বলে।"

"অশেষ ধন্যবাদ। আমি প্রাণে বেঁচে আছি বটে তবে ওরা আমার ঘর দোর ভেঙে তচ্‌নচ্ করে দিয়েছে"। আমাকে দেখিয়ে বলে, "আমার ভাই, কলকাতা থেকে এসেছে কাল রাত্রির ট্রেনে। ভাগ্য ভাল খুব বেঁচে গেছে।"

মিঃ শর্মা উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "জিপ্ দাঁড় করানোর সময় দুটো লোককে পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। চলুন ওদের ধাওয়া করা যাক, দেরি হয়ে গেলে ব্যাটারা পালাবে।"

সুরজিতদা তাড়াতাড়ি জিপে উঠে বসলে আমিও পেছু পেছু উঠলাম। একটা আরমড কনেসটেবলকে বাংলোয় দাঁড় করিয়ে পাহাড়ের দুদিক থেকে দুভাগ করে সুরজিতদার নির্দেশমত সবাই এগিয়ে চলল। ওদের ঘাঁটি সুরজিতদা আগেই দেখে রেখেছিল পাহাড়টার ওপরে জঙ্গলের মধ্যে। তাছাড়া একটা লোককে মনে হল পাহাড়ের ওপর থেকে সরে ছুটে যেতে। ওপরে গিয়ে ওদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে দেখে শর্মা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারের নির্দেশ দিল। কাজ হল, ঘন ঘন ফায়ারিংএর আওয়াজে ওরা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে। হ্যাণ্ড কাফ্ দিতে বেগ পেতে হল না। ওরা তাড় খেয়ে মাতাল হয়েছিল। ভ্যানে তুলে বাংলোর কাছে নিয়ে এসে খানাতল্লাসী করে ওদের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না। শর্মা ও সুরজিতদার সঙ্গে বাংলোর ভেতরে ঢুকে দেখি ঘর গুলোর ওপর দিয়ে যেন পাগলা হাতি চলে গেছে। সুরজিতদা শৌখিন লোক, তার ড্রইং রুমের জিনিস পত্তর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ওর দুটো সুটকেস একটা ট্রাঙ্ক ভেঙে তুবড়ে পড়ে আছে। কৌচের ও খাটের গদি ছিঁড়ে সব দেখেছে, তুলো চারি দিকে উড়ছে।

শর্মা বলে, "মিঃ সান্যাল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? ব্যাটারা হাতে রক্ত মেখেছে মনে হচ্ছে।"

সুরজিতদা হেসে বলে ওটা আমারই কাজ। কলকাতা থেকে Ox blood এক টিন দামি পেণ্ট এনেছিলাম জিনিস পত্তর রঙ করার জন্য। আমি কাল বিকেলে সুটকেস ট্রাংক কোলাপসিবিল গেটে পুরু করে রঙ মাখিয়ে রাখি। ট্রাংক সুটকেস ও দরজা ভাঙার সময় ওদের হাতে রঙ লেগে যায়। ওদের চালান করতে অসুবিধা হবে না এই দেখুন আঙুলের ছাপ পড়েছে সুটকেশ ট্রাংকের ওপর। এ গুলো ভাল করে ভ্যানে তোলান।

শর্মা বলে উঠলেন, বলিহারি যাই আপনার বুদ্ধি, এবার ওদের বাগে পেয়েছি। সে ত হল, আপনার টাকা?

সুরজিতদা বাইরে বারান্দায় রাখা একটা বাঁশের ভাঙা মই ঘরে আনতে বললে। একটা ভেনটি-লেটারের নীচে মই লাগিয়ে আমাকে মই বেয়ে উঠে যেতে বললে। উপরে উঠে দেখি ভেন্টিলেটারের বাইরের দিকে গ্রিলের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ময়লা কাগজের প্যাকেট। আমাকে ওটা নামিয়ে আনতে বললে। প্যাকেট খুলে দেখা গেল তার মধ্যে একশ টাকা নোটের মোটা তাড়া।

শর্মা বিস্মিত হয়ে বলে, সত্যি আপনি একটা জিনিয়াস।

—০—

খবর আর খবর

পার্থ সারথি দত্ত

মেশিন থেকে বোলিং

আগে বোলিং করত কেবল মানুষ। এখন কিন্তু যন্ত্র থেকেও বোলিং করা হচ্ছে এবং সেই বোলিং উন্নত মানের বোলিং-এর সমান।

লিণ্ডসে বডিজ নামে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এর এক অধিবাসী এই সাড়া-জাগানো যন্ত্রটি নির্মাণ

করেছেন। ইনি চোদ্দ বছরের নিচে ছেলেদের প্রশিক্ষণ করেন এবং মাঝে মাঝে আম্পায়ারিং করে থাকেন। তাঁর ছেলে, বার বছরের পিটারকে, ব্যাটিং টেকনিকে উন্নত করার জন্য যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছেন। আপাততঃ এটি ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে আছে।

এবারে যন্ত্রটির গঠনের কথায় আসি, যন্ত্রটিতে দু'টো অনুভূমিক চাকা আছে। এবং চাকা দুটো মোটর দিয়ে চলে, চাকা দুটোকে বিভিন্ন অবস্থানে রেখে বিভিন্ন রকম বোলিং করা হয়। চাকা দুটোর ঘূর্ণনের ফলে বল বেরিয়ে আসে। বলকে এই দুটো চাকার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন রকম বোলিং করা হয়। ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন অনুসারে গুড লেংথ, শর্ট পিচ, বাউন্সার, ইয়র্কার, কখন বা স্টাম্পের বাইরে বোলিং করা হয়। যন্ত্রটি থেকে ঘণ্টায় ৩০০ টি বল নিক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ মিনিটে পাঁচটি বল। বুঝতেই পারছ কত তাড়াতাড়ি খেলতে হয়। যন্ত্রটি সব থেকে বেশি উপকারে লাগবে তাদের যারা বাউন্সারকে ভয় করেন।

সঠিক নিশানায় বল ফেলার জন্য যন্ত্রটিকে দু'টো উচ্চতায় রাখা যায়। ছোটদের জন্য ১৭৩ সে. মি. এবং বড়দের জন্য ২১৩ সে. মি. উচ্চতায়।

এই যন্ত্র থেকে টেনিস বল নিক্ষিপ্ত হয় ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে এবং ফুল সাইজের বল নিক্ষিপ্ত হয় ঘণ্টায় ৮৫ কিমি বেগে। এই দুই গতি উন্নতমানের ফাস্ট বোলিং এর সমতুল্য। ভাবত একবার, অমন, তীব্র গতির বলের বিরুদ্ধে অত তাড়াতাড়ি খেলা কী কঠিন ব্যাপার? এবং খেললে ব্যাটিং টেকনিক, ফুট-ওয়ার্ক, মনোযোগ, এবং আত্মবিশ্বাসের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

যন্ত্রটির উপকার কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এটি ফিল্ডিং-ও অনুশীলন করায়, যন্ত্রটিকে সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে ৩৬০° কোণে ঘুরিয়ে একই সঙ্গে অনেক খেলোয়াড়কে ক্যাচ প্র্যাকটিশ করানো যায়।

এই যন্ত্রটিকে আরও উন্নত মানের করা হয়েছে। যার সুবাদে এর ক্ষমতা আরও বেড়েছে। এখন এই যন্ত্রটি কোন খেলোয়াড়ের ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংকে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে।

এই দুনিয়ার আজব খবর

বরুণ মজুমদার

বুলন্দর জেলার আহমেদপুর গ্রামে ধনবতী নামে এক মহিলা একসঙ্গে সাতটি শিশুর জন্ম দিয়েছেন। ছটি শিশু জন্মের কিছু পরেই মারা গেছে। সপ্তমটি ভালই আছে। কাছাকাছি গ্রামগুলোতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মা এবং তার শিশুদের দেখবার জন্য কাতারে কাতারে লোক সেখানে এসে জড় হতে লাগলেন।

* * *

রাজস্থানের কোটা জেলার নওয়ালী গ্রামের রাম-দেখলেন যে তার মা আগুনে পুড়ে যাচ্ছেন, সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচাতে গেলেন। মা হাঁচলেন বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ মারা গেছে। তার মায়ের কাপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। মায়ের গোঙানি শুনে রামপ্রসাদ ছুটে গেলো। সে আগুন নেভাতে চেষ্টা করলো। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মা ও ছেলেকে হাসপাতালে পাঠানো হল। সেখানে ছেলের মৃত্যু ঘটলো মা বেঁচে গেলেন।

—০—

ছবি আঁকো | তাপসী আইচ

ডানপাশে ছবি দেখছো ঘর কাটার মধ্যে রেখা চিত্র রয়েছে। নীচেও একটা ঘরকাটা দেওয়া হলো। তোমাদের ছবিটি—আঁকবার সুবিধার্থে দেওয়া হয়েছে, কোন রেখাটি কতখানি দূরত্বে আছে, নীচের খোপে ঠিক ঐ রকম একটা রেখাচিত্র করো। পরে রঙ করে পাঠাও।

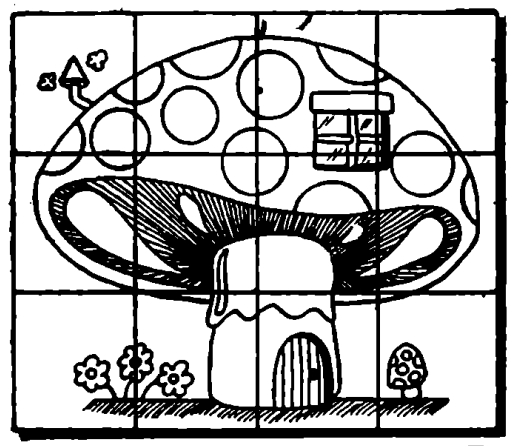

ধাঁধা

১। গাছ না হলেও আছে পাতা
মুখ নাই তবু বলে কথা।
বুদ্ধি নাহ [illegible] ধড়ে
বুদ্ধি বিলায় সে যাকে তাকে।

২। তিন অক্ষরে নাম তার
আছে এক দেশ।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
গলায় মানায় বেশ।

৩। তিন অক্ষর নাম তার
খেতে বেশ লাগে মজা।
মাঝের অক্ষর নিলে পরে
চুমুক দিয়ে পান করে।

* উত্তর আগামী সংখ্যায়

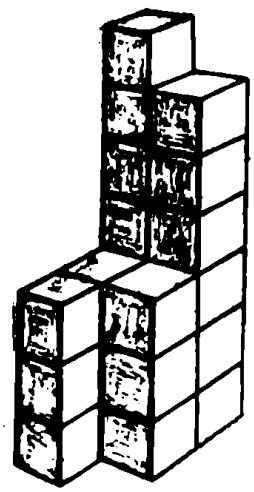

অনুসন্ধান | চন্দন বসু

প্রশ্ন : ছবি দেখে বাঁ পাশের নিচে কতকগুলো বাক্স আছে সেটা বলতে পার? লিখে পাঠাও।

উত্তর : গত সংখ্যায় ডান পাশের ছবিটিতে মিল আছে খুঁজে বার করার ইঞ্জিন উল্টে দেওয়া ছিল, সোজা ভাবে দেখে মিল ৩ নং এবং ৭ নং ছবির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন যিনি—

প্রসেঞ্জিৎ সান্যাল। রিষড়া

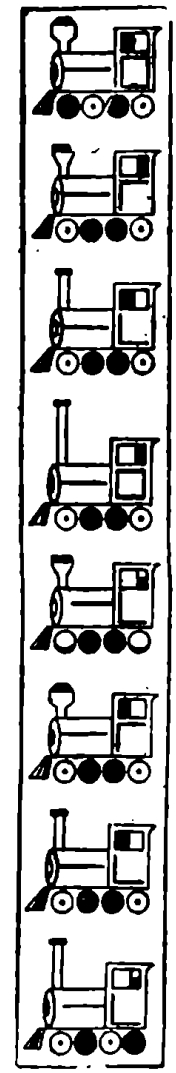

জান কি ?

চিঠি ● চিঠি ● এবং জবাব

তোমাদের লেখা জানা অজানা প্রশ্নের উত্তর কিছু দেওয়া হলো। — নন্দিতা বসু

মানুষের (পূর্ণ বয়স্ক) মেরুদণ্ড কত লম্বা ?
৪৫ সেন্টিমিটার।

রক্তের রং লাল কেন ?
আমাদের রক্তে শ্বেত ও লোহিত দুই প্রকার রক্ত কণিকা থাকে। লোহিত (লাল) কণিকার সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া রক্তের রঙ লাল।

যকৃত কোন্ স্থানে থাকে ?
পেটের ভিতরে ডান দিকে।

প্লীহা কোন্ স্থানে থাকে ?
পেটের ভিতরে বাম দিকে।

হৃৎপিণ্ড শরীরের কোন্ দিকে থাকে ?
বুকের বাম দিকে পাঁজরের নীচে।

মানবদেহ কি কি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত ?
অম্লজান, যবক্ষারজান, গন্ধক, ক্লোরিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ও ফসফরাস।

নখ, চুল, কাটিলে লাগে না কেন ?
স্নায়ুর দ্বারা মানুষ ব্যথা বুঝিতে পারে। নখ ও চুলের সঙ্গে কোন স্নায়ুর যোগ নাই। সেইজন্য ঐগুলি কাটিলে কোন ব্যথা লাগে না।

হেঁয়ালি

পাটুলি পুত্র

শিক্ষক : কি রে কাবুল অঙ্কটা করেছিস ?

কাবুল : হ্যাঁ সার, এই যে।

শিক্ষক : তোর অঙ্ক হয়নি। কুড়ি পয়সা করেছিস কেন ? ওটা চল্লিশ পয়সা হবে। আর কুড়ি পয়সা কোথায় গেল !

কাবুল : অন্যদিন ঠিক করে আনবো, আজকে ছেড়ে দিন, স্কুলের ম্যাচ আছে। যেতেই হবে !

শিক্ষক : না-না সেটি হচ্ছে না, আগে ওটা চল্লিশ পয়সা কর তবে ছাড়বো।

কাবুল : তবে আমার টাকনের পয়সা থেকে কুড়ি পয়সা দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তো চল্লিশ পয়সা হয়ে যাচ্ছে। —এবার ছেড়ে দেবেন তো সার !

দারোগা : রামসিং। তাড়াতাড়ি তিনকড়িকে ওর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আয়। ওর নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে।

রামসিং : এই যে সাব হাম তিনকড়িকে লে আয়া হ্যায়।

দারোগা : একি ! তুই দুজনকে বেঁধে নিয়ে এসেছিস কেন ? এদের দুজনেই কেউ তো তিনকড়ি নয় !

রামসিং : সাব আপনি বোলা হ্যায় তিনকড়িকে লে আও। তো তিনকড়ি বাড়ি নেহি ছিল। ওর মেজোভাই দোকড়ি আউর ছোটা ভাই এককড়ি ছিল। তা দুজন মিলে তিনকড়ি বনকে লে আয়া !

বুদ্ধির খেলা

বিষ্ণু দত্ত

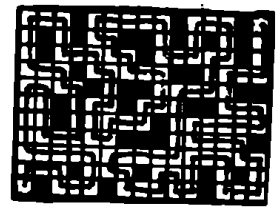

গত সংখ্যায় দেয়া ডান পাশের ছবিতে 'শুরু' থেকে ডান দিকের উপরে 'শেষ' লেখা পর্যন্ত সাদা ঘর দিয়ে সোজা লাইনে আঁক কেটে যেতে হবে :—

অনেকের পাঠানো চিঠিতে একজনই ঠিক ঠিক করতে পেরেছেন। সেই ছবিটি উপরে দেখ কিভাবে করেছেন।

আনন্দিতা চক্রবর্ত্তী (হাওড়া)

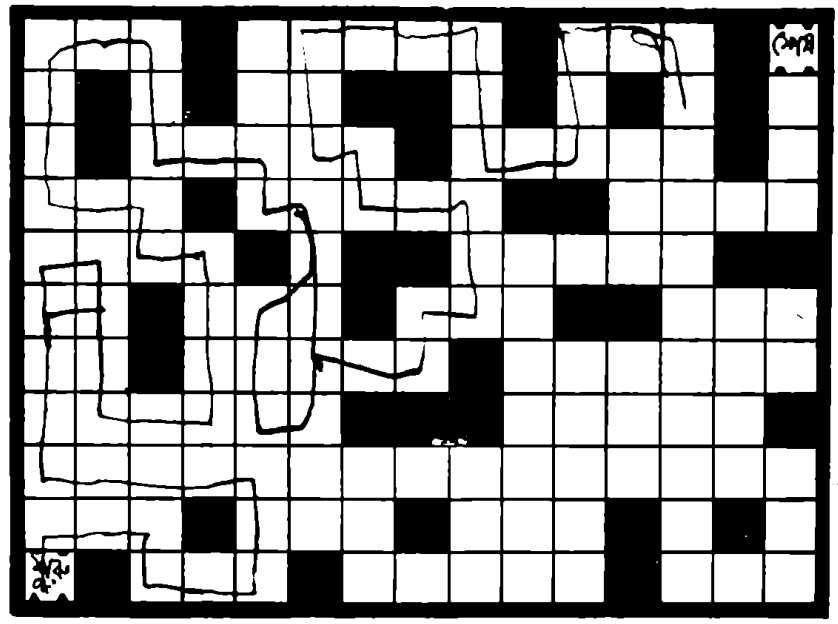

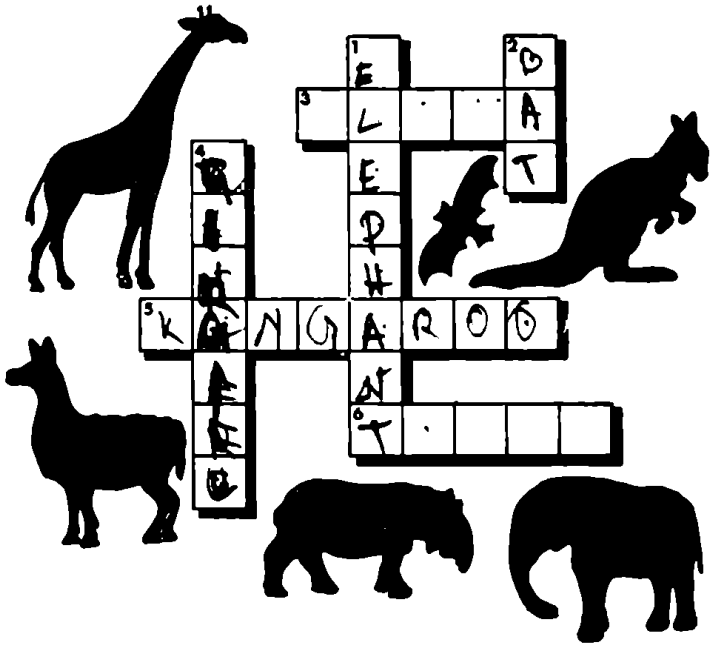

এবার পাশের ছবিটি দেখ। ছবিতে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬) ৬টি প্রাণী দেওয়া আছে। এখন তোমাদের শূন্য ঘর গুলো ইংরেজী শব্দে পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি এবং উপর নীচ মিল করে ইংরেজী শব্দ দিয়ে পুরণ করলে কোন প্রাণীটিকে ইংরাজীতে কি বলে তা তোমাদের চেনা হয়ে যাবে। কোন্ প্রাণী এখন কত নম্বরে বসবে ঠিক ঠিক উত্তর করে পাঠাও।

সঠিক উত্তরে—বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা, পরের সংখ্যায় থাকবে।

রেজিঃ, ডবলু. বি, ১১৭/৮৩ • Rs. 2·50 • August '83

এবারের শারদ সংখ্যা

শুকতারা

তোমাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস, গল্প,
কল্প-বিজ্ঞান, ৪টি কমিকস সেরা লেখকেরা

৮টি উপন্যাস লিখছেন ৮টি বড় গল্প লিখছেন

এ ছাড়া আকর্ষণীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

সঙ্গে

অজস্র রঙীন ছবি

ইতিহাসের পাতা থেকে

৮টি বিশেষ রচনা লিখছেন

তোমার কাছের স্টলে বলে রাখ

৪০০ পৃষ্ঠা নিয়ে সেপ্টেম্বরেই বেরুচ্ছে

২৭ বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২